উত্তরায়ণ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

প্রবোধকুমার সান্যাল

করকমলেষু

উত্তরায়ণ

আরতির অবস্থাটা বোঝাতে হলে উপমা দিয়ে বোঝাতে হয়।

অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে ভেঙে-পড়া ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে করতে অকস্মাৎ আলো দেখা দিল; সেই আলোতে জীবনের আশ্বাস ফিরে পেয়ে সর্বপ্রথম নজরে পড়ল, এক কোণে মেঝের সঙ্গে গেঁথে রয়েছে একটা আংটি; মলিন গেবে-যাওয়া একটা আংটি। হয়তো পিতলের, নয়তো তামার? কিন্তু তা যাচাই করবার বা সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখবার সময় তো তখন নয়। নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মেঝেয় গেঁথে যাওয়া আংটিটা বিচিত্রভাবে মনের মধ্যে মাজা-ঘষা হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে, তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায় অনেক কাল আগে হারিয়ে যাওয়া বহুমূল্য হীরের আংটিটির কথা। সেই গড়ন। ঠিক সেই আকার! ঠিক সেই আংটি। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে ওঠে প্রাণ-মন; হৃৎপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করে মাথা কুটতে থাকে চরমতম উত্তেজনায়, পায়ের আঙুল থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত সর্বাঙ্গ যেন কাঁপতে থাকে; মাথার ভিতরটায় স্মৃতিবাহী সমস্ত স্নায়ু-শিরাগুলি যেন ঝনঝন করে ওঠে; ছুটে গিয়ে সেটিকে ফিরে পাবার, অন্তত যাচাই করে দেখবার আকুল আগ্রহে অধীর হয়ে ওঠে জীবন।

ঠিক তা-ই হল আরতির। অধীর হয়ে উঠল আরতি।

১৯৪৬ সনের ১৯শে আগস্ট।

বউবাজার অঞ্চলে, কপালিটোলা লেনের কাছাকাছি একটি গলিতে একখানা পুরনো আমলের বড় বাড়ি! ১৬।১৭।১৮ তিনদিন তিনতলার ছাদে এক-কোণে-পড়ে-থাকা গত তিরিশ-চল্লিশ বছরের কি তারও বেশী কালের অব্যবহার্য কয়েকটা জলের ট্যাঙ্কের একটার মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে পড়েছিল। ১৬ই তারিখের রাত্রি তখন ৮টা। দিনের বেলা থেকেই বাড়ি থেকে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সে-কথা মনে হলেই তার বাল্যকালে মামার বাড়িতে কালীপূজার রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে একশো সওয়াশো পাঁঠা বলি হত। সন্ধ্যা থেকে একটা খোঁয়াড়ে পাঁঠাগুলোকে এনে পুরে দিত এবং বলির পূর্বকাল পর্যন্ত সতর্ক প্রহরা থাকত চারিপাশে। লাঠি বা খোঁচা যা-কিছু দিয়ে হোক, যে-পশুটা মুখ বের করবার চেষ্টা করত, তার মুখেই আঘাত করে ভিতরে ঠেলে দিত। তারপর একে একে হত বলিদান। এক-সঙ্গে দু-তিনটেকে বলি দেওয়াও আরতি দেখেছে। ১৬ই বিকেল থেকে তাদের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই। তারা মানুষ, তাই তারাও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল—নইলে ঠিক বলির পশুগুলোর মত ভীতার্ত হয়ে তারা একসঙ্গে এক জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সন্ধ্যের পর থেকেই তাণ্ডব শুরু হয়েছিল! রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে নরকের যবনিকা উঠে প্রকট হল পৈশাচিক উৎসব। এতটা আশঙ্কা কেউ করে নি। বংশ [illegible] এ ছিল কল্পনার অতীত। বিকট চিৎকার উঠল।

লাল মশালের আলো জ্বলল। দল বেঁধে ঘর ভাঙল। দানবের মত চোহারা নিয়ে দলবদ্ধভাবে ঘরে ঢুকল। হত্যা, লুঠ, নারীদেহের উপর পশুর বীভৎস অত্যাচার। তারপর আগুন লাগিয়ে চলে গেল। দূর থেকে তা চোখে দেখা যায় না, প্রত্যক্ষদর্শী দেখেও বর্ণনা করতে পারে না। যে-টুকুও পারে, কানে শুনে মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। অথচ যারা অত্যাচার করলে, তারা তা পারলে। যাদের উপর অত্যাচার হল, তাদের মধ্যে কয়েকজন সহ্য করেও বেঁচে রইল।

একটা দৃশ্য আরতির মনে আছে। একতলায় দরজা ভেঙে তখন সত্ত ঢুকেছে বর্বরের দল। দোতলা বাড়িটা এক-কুঠুরি দু-কুঠুরিতে ভাগ করা বহু-ভাড়াটে অধ্যুষিত একখানা বাড়ি। দুটি তলায় অন্তত কুড়িটি ভাগে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জনের বাস। তার মধ্যে শিশু এবং নারীতে পঁচিশ জন। পুরুষের সংখ্যা কুড়ি-বাইশ। পুরুষহীন পরিবার বড় একটা ছিল না, আরতি ছাড়া। আরতি দুখানা ঘর আর একটা স্বতন্ত্র বারান্দা নিয়ে বাস করত—বাবার সহায়সম্বলহীনা এক বুড়ী পিসীকে নিয়ে। বাড়িখানা আরতিরই বাড়ি। আরতির বাবা কিনেছিলেন প্রায় ৩০-৩৫ বৎসর আগে—লাভের লোভে। সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু রাস্তার স্কীম তখন সত্ত কাজে পরিণত হবে। একজন বাড়ির দালাল তখন তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, পুরনো বাড়িটা সস্তায় কিনে খুব ভালো রঙ্‌চঙ্‌ করলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাছে অনেক বেশী দাম পাওয়া যাবে। যারা দাম কষবে, তাদের কিছু টাকা দক্ষিণা দিলেই হবে। সবই

হয়েছিল, কিন্তু বাড়িটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে পড়ে নি। নিচের তলার দরজা যখন ভাঙল—তখন একবার একটা কলরব উঠল। কলরব নয়, একটা ভয়ার্ত ক্রন্দন-রোল। ও—। সে 'ও—' রোল ওই বর্বরদের হা-হা শব্দের চেয়েও মর্মান্তিক, এবং তার মধ্যে সে যে কী বিভীষিকা, সে যে না শুনেছে, তাকে বলে বোঝানো যায় না। পুরনো কালের চকমিলান ভিতরে উঠানওয়ালা বাড়ি; নিচের উঠানে মশালের আলো হাতে তারা ঢুকে হা-হা চিৎকারের সঙ্গে ধ্বনি দিয়ে উঠল। ঈশ্বরের নামকে কলঙ্কিত করে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ধ্বনি! বুড়ী ঠাকুমা সর্বাগ্রে একটা অমানুষিক 'ও—' চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল বারান্দায়। 'ঠাকুমা'—বলে তাঁকে ডেকে ফেরাতে গিয়ে আরতি এসে পড়ল সিঁড়ির মুখে। নজরে পড়ল, আক্রমণকারীরা তখনও বাড়িতে ঢুকছে এবং প্রথম দল এগিয়ে আসছে সিঁড়ির মুখে। তারা উঠবে উপরে। মুহূর্তে আরতি ছাদের সিঁড়ি ধরল। ছাদের দরজাটায় খিল ছিল না, শুধু ছিল উপরে নিচে ছিটকিনি। তাও উপরেরটা অচল, নিচেরটাই ছিল সচল! ছাদে এসে সর্বপ্রথম চেয়েছিল সে ছাদ থেকে দরজা বন্ধ করে শিকল আটকাতে। কিন্তু শিকল ছিল না। তবুও সে কড়াদুটো ধরে দরজাটা টেনে দিয়ে চারিদিকে খুঁজেছিল একটু আশ্রয়। একবার ছুটে গিয়েছিল আলসের ধারে। গিয়ে শিউরে উঠেছিল। নিচের রাস্তা পর্যন্ত উচ্চতার পরিমাপ দেখে নয়। রাস্তায় দানবিক উল্লাস দেখে, মশালের আলো দেখে, চারিপাশের বাড়িতে বাড়িতে চিৎকার শুনে। একটু দূরে একটা বাড়ির ছাদে

দেখেছিল, একটি মেয়ে ভয়ে পাগলের মত চিৎকার করে ছুটে বেড়াচ্ছে, তাকে ধরবার জন্য হা-হা শব্দে অট্টহাস্য করে ছুটছে একটা পশু। তার পাশেই একটা পুরুষকে একখানা ছেনি দিয়ে আঘাত করলে আর তুজন। আরতি এবার বুদ্ধি-বিবেচনা না করেই ছুটে গেল ছাদের দরজার দিকে। নিচে নেমে যাবে সে। কোথায় যাবে তা জানে না—তবে নিচে যাবে! মনে ভাসছিল নিজের ঘরখানি। কিন্তু ছাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিচের সচল ছিটকিনি আটকাবার আংটাটা ভেঙে যাওয়ার পর সিঁড়ির উপরেই একটা গর্ত খুঁড়ে নিয়েছিল বাড়ির লোকেরাই; দরজা ঠেলে দিলেই ছিটকিনিটা আপনি পড়ে যেত গর্তটার মধ্যে। চিৎকার আপনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল তার গলা থেকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের মুখ নিজে চেপে ধরেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আত্মরক্ষার সচেতন বুদ্ধি ফিরে এসেছিল তার। ওই স্তূপীকৃত বাতিল জলের ট্যাঙ্কগুলোর কাছে ছুটে এসে, গুঁড়ি মেরে কোন রকমে আলসের ধার ঘেঁষে একেবারে কোণটায় এসে বসেছিল; কিন্তু তাতেও তার স্বস্তি হয় নি। সব চেয়ে নিচের ট্যাঙ্কটার ভাঙা মুখটার মধ্য দিয়ে গলে সে ভিতরে ঢুকে বসেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই, কি তার মিনিটখানেক পরেই, ছাদের দরজায় ধাক্কা পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্বরদের উচ্চকণ্ঠের কথা শুনতে পেয়েছিল, "বন্ধ্ হ্যায়। তব্ তো আদমি হ্যায় ছাদকা অন্দর। তোড়ো!"

তুমদাম শব্দ উঠল। আরতি দাঁত টিপে চোখ বন্ধ করে পড়ে

রইল। তারপরই শুনতে পেল, "আরে-আরে—ইধরসে বন্ধ্ হ্যায়, উয়ো ছিটকিনি উঠাও, উয়ো দেখো। উঠাও।"

পরমুহূর্তেই দরজাটা খুলে গেল। কতগুলো বলতে পারে না আরতি, তবে মনে হল, অসংখ্য উন্মত্ত দর্পিত পদক্ষেপে ছাদখানা বুঝি ভেঙে পড়বে। পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেড়াল তারা।

"ইধর দেখো। ইয়ে পানিকে টাঙ্কিকে ইধর।"

জীর্ণ ট্যাঙ্কগুলোর উপর প্রথম পড়ল কয়েকটা লাঠির আঘাত, উপরের দুটো ট্যাঙ্ক হুড়মুড় করে পড়ল স্থানচ্যুত হয়ে। একটা পড়ল ছাদের ভিতরের দিকে ; অন্যটা পড়ল আরতির আশ্রয়স্থল ট্যাঙ্কটা এবং আলসের মধ্যবর্তী ফাঁকটার উপর। অন্ধকার হয়ে গেল পৃথিবী। আরতির জীবনের বোধ করি সর্বোত্তম সৌভাগ্য সেই অন্ধকার। ভগবান-দেবতা মানলে সে মনে করত এবং বলে বেঁচে যেত—'ভগবান যেন অন্ধকার হয়ে আমাকে বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।'

কারণ ওতেই বেঁচে গেল সে। ওধারের ট্যাঙ্কটা থেকে পচা জল এবং আরও কিছু এমন ছাদময় গড়িয়ে পড়ল, যার জন্য ওই পশুর দল তোবা-তোবা বলে পিছিয়ে গেল। এই ট্যাঙ্কটার মধ্যেও আরতি এমনি দুর্গন্ধময় পচা জলের স্পর্শ অনুভব করছিল, আর তার সঙ্গে নানান ধরনের কীটের স্পর্শ। উচ্চিংড়ে, আরশুলা, আরও অনেক কিছু। এরই পর হঠাৎ তীব্র জ্বালাকর দংশন অনুভব করেছিল সে। তারপর আর মনে নেই। যন্ত্রণায় চেতনা বিলুপ্ত হয়েছিল তার। চেতনা যখন ফিরেছিল, তখন দিনের আলো

চারিদিকে। যে-কয়টা ছিদ্র ছিল, তার ভিতর দিয়ে কয়েকটা রশ্মি-রেখা এসে ভিতরে পড়ে ভিতরের অন্ধকারকে স্বচ্ছ করে তুলেছিল। অসহ্য তৃষ্ণা। কিন্তু চারিদিকে ওই পৈশাচিক উল্লাস কলরোলের বিরাম ছিল না। ছাদের উপর থেকেই টের পেয়েছিল, দোতলায় গোলমাল উঠছে; নানান ধরনের শব্দ উঠছে; ভারী জিনিস—কারা যেন টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দোতলায় কি হচ্ছে, তা সে মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিল,—ট্যাঙ্কের ছিদ্র এবং আলসের ফাঁক দিয়ে সামনের একটা বাড়ির তেতলার ঘরে যা হচ্ছিল তা প্রত্যক্ষভাবে চোখে দেখে। সে দেখতে পাচ্ছিল সামনের বাড়ির তেতলার ঘরটায় দিনের আলোতেও খুন হচ্ছে, নারী-ধর্ষণ হচ্ছে, লুঠ হচ্ছে। সামনের বাড়ি তেতলার ঘরের জানলাটা খোলা, মেঝেটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে একজন বুড়ী রক্তের প্লাবনের মধ্যে ভাসছে, একটি অর্ধোলঙ্গ যুবতী মেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে, গোঙাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে কতকগুলো লোক আসছে এবং ঘরের জিনিসপত্র টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। বাক্স-ব্যাগ, দেওয়াল-ঘড়ি, রেডিও, কাপড়-চোপড়, যে যা পাচ্ছে টেনে নিয়ে চলেছে। সেই মুহূর্তে কয়েকজন খাট খুলছিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়না খুলে ফেলেছে। ড্রয়ারগুলো টেনে উপুড় করে ফেলে দেখছে। তৃষ্ণা তার আতঙ্কে শুকিয়ে গেল। মনে হল—চেতনা তার বিলুপ্ত হয়ে আসছে, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সচেতন রাখলে সে। অচেতন অবস্থায় সামনের বাড়ির ওই অচেতন মেয়েটার মত এমনি গোঙানি যদি তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে! তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল বর্ষার আকাশ। ঘন

মেঘ করে এসে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল ; ট্যাঙ্কের উপরের দিকের টিনটার একটা ছিদ্র বেয়ে গড়গড় করে জল পড়তে শুরু হল সেই জল ব্যাকুল অঞ্জলিতে ধরে খেয়ে বেঁচেছিল। সুস্থ হয়েছিল। বেলা তখন কত, তা তার জানবার কথা নয়। হঠাৎ এই কলরোল আবার বাড়ল। এবার ধ্বনির উত্তরে ধ্বনি উঠতে লাগল। নজরেও পড়ল, উত্তর দিকে বড় বড় বাড়িগুলির ছাদে লোকের চলাফেরা। তারা এরা নয়। তারা আক্রান্ত, তাদের সম্প্রদায়ের লোক। হাতে বড় বড় থান ইঁট, আরও কত কিছু, বন্দুকও দেখতে পেলে তাদের হাতে। বন্দুকের শব্দ গত রাত্রি থেকেই হচ্ছে। বড় বড় বিস্ফোরণের শব্দ উঠতে লাগল। জ্বলন্ত কাপড়ের পুঁটলি পড়তে লাগল। একবার এদের ধ্বনি এগিয়ে যায়, একবার ওদের ধ্বনি এগিয়ে আসে। সন্ধ্যা থেকে বাড়তে লাগল তাণ্ডব। সে-তাণ্ডব শেষ-রাত্রের দিকে স্তব্ধ হল। তখন একবার বের হয়েছিল সে। আর থাকতে পারেনি। বেরিয়ে একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেহখানাকে যতটুকু পারে সুস্থ করে নিয়েছিল। ঊর্ধ্বলোকে আকাশের নক্ষত্রমালার দিকে যে-ভগবানকে সে বিশ্বাস করে না, সেই ভগবানকে ডেকে বলেছিল, "হে ভগবান—রক্ষা কর, রক্ষা কর। নইলে মৃত্যু দাও।" চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল।

ময়লা জলের ট্যাঙ্ক থেকে আকণ্ঠ জল খেয়েছিল।

ভগবানের পাঠানো কি না সে জানে না, তবে কাকের বা চিলের মুখ থেকে খসে-পড়া আধখানা পোড়া রুটিও হঠাৎ সে পেয়ে গিয়েছিল। ভোরবেলার আগেই এসে আবার সে সেই ট্যাঙ্কটার

ভিতর ঢুকেছিল। ১৮ই তারিখে এ-বাড়িতে আর কোন সাড়া পায় নি। শুধু বার তিনেক কোন একজনের শিস শুনেছিল ; শিসের সঙ্কেত নয়, শিস দিয়ে গান। বাড়িটা যেন ইডেন গার্ডেনের একটি নির্জন প্রান্ত, সেই নির্জন প্রান্তে কোন দেওয়ানা বা বিলাসী ঘুরছে আর শিস দিয়ে গান করছে। কোলাহল ছিল রাস্তায়। প্রচণ্ড কলরব আর কোলাহল, ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি, বোমার শব্দ। সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণকারীর দলের ধ্বনি পিছনে উঠল। সন্ধ্যার পর নূতন কিছু আরম্ভ হল। অনবরত প্রায় বন্দুকের শব্দ—আর প্রচণ্ড বেগে লরী ছোটার শব্দ।

ফট-ফট-ফট-ফট দুম-দুম। সে আর কান পাতা যায় না।

ধ্বনি-কোলাহল প্রায় স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে এক-আধবার শোনা যায় শুধু। কখনও শোনা গেল এক একজন মানুষের মর্মান্তিক আর্ত চিৎকার।

১৯শে সকালবেলা। আবার বাড়ির নিচে মানুষের পদশব্দ শোনা গেল। অনেক মানুষ। যেন প্রতিটি ঘর খুঁজছে। কথা কানে এল, "কেউ বেঁচে আছ ? সাড়া দাও—আমরা উদ্ধার করতে এসেছি!"

সামনের তেতলা বাড়িটার ঘরে কয়েকজন এসে ঢুকল।

"কেউ আছ ?"

আর সন্দেহ রইল না। চিৎকার করতে চেষ্টা করল সে,

"ওগো—ওগো—আমি আছি! বাঁচাও!" কিন্তু কণ্ঠস্বর তার ফুটল না। সে বের হয়ে আসবার জন্য চেষ্টা করলে। কিন্তু তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, দেহে যেন একবিন্দু শক্তি আর অবশেষ নেই। সামনের ট্যাঙ্কটা তার ঠেলায় পড়ে গিয়ে একেবারে মোক্ষম হয়ে মুখ আটকে বসে গেল। এবার একটা চিৎকার করে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান যখন হল, তখন তাকে ধরাধরি করে নামানো হচ্ছে। তাকে এনে তুললে একটা লরীতে। লরীতে গাদাগাদি লোক, পুরুষ নারী শিশু যুবা বৃদ্ধ। প্রেতার্ততার আতঙ্ক মুখে-চোখে। তাদের বাড়িটার এক বুড়ো রয়েছে, আর পুরুষ কেউ নেই, তিনটি মধ্যবয়সী মেয়ে রয়েছে, মুখে কালসিটের দাগ, বুকে দাগ; মুখাবয়বে আতঙ্ক-লজ্জা-ঘৃণার স্মৃতি মাখানো এক উদাস ক্লান্তি। সূর্যে সর্বগ্রাসী গ্রহণ যে-সময়টিতে পূর্ণ হয়, সেই সময়টিতে পৃথিবীর সর্বাঙ্গে যে-ছায়া ফুটে ওঠে, এ যেন ঠিক সেই ছায়া; সর্বনাশের ছাপ!

চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু ধরে মেডিক্যাল কলেজের সীমানা পার হয়ে গাড়িটা যখন মীর্জাপুর স্ট্রীট ধরে ঘুরছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার নজরে পড়ল।

এই কয়েক দিনরাত্রির দুরন্ত দুর্যোগকে এক মৃত্যু-বিভীষিকাময় প্রলয়-রাত্রির সঙ্গে তুলনা করে বলতে গেলে বলতে হয়, দুর্যোগ অবসানে সূর্যোদয়ের মত ওই মুহূর্তটিতে নজর পড়ল, মাটিতে-ধূলায়, আবর্জনার-কালিমায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটি আংটি।

একটি মানুষ। রোদে-পোড়া রঙ, তামাটেও নয়, কালোই হয়ে

গিয়েছে। মাথায় রুক্ষ ধূসর বড় বড় চুলের কয়েক গোছা লালচে হয়ে গিয়েছে। ঘন চুলের নিচে কপালখানি বড় ছোট, ওই ছোট কপালের ত্রিবলী রেখার দাগগুলি ময়লা জমে পেন্সিলের দাগের মত হয়ে রয়েছে। বাকি মুখটা দাড়ি-গোঁফে ঢেকে গিয়েছে। চোখে শান্ত উদাস দৃষ্টি।

বারেকের জন্য আরতির দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলল। তারপর ক্লান্তিভরে আরতিও দৃষ্টি নামিয়ে নিলে; সেও অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে। আরতির কোন কিছু মনে করার অবস্থা তখন ছিল না। শুধু মনে হল, লোকটা বড় রোদে পুড়ে গিয়েছে। পরমুহূর্তেই একটি রশ্মিরেখা আপনি জ্বলে উঠে তার মনের অতীত কালের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্মৃতির ঘরে বারেকের জন্য ঝলকে উঠে আবার নিভে গেল।

লরীটা মোড় ফিরল আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

নিদারুণ ক্লান্তির উপর আগস্টের প্রখর রৌদ্রে আরতি কেমন হয়ে যাচ্ছিল। দ্রুত ধাবমান কোন খোলা যানের উপর বসে যেতে যেতে পাশের বাড়িগুলোকে পিছনে ছুটছে বলে মনে হয় স্বাভাবিক-ভাবেই, কিন্তু আরতি দেখছে আরও কিছু। সে দেখছে, বড় বড় বাড়িগুলো কাত হয়ে পড়তে পড়তে পিছনের দিকে যেন ডিগবাজি খেয়ে চলে যাচ্ছে।

এরপর একটা বিস্ফোরণের শব্দ তার কানে এসেছিল।

একটা বোমা পড়েছিল আমহার্স্ট স্ট্রীট আর মেছুয়াবাজার স্ট্রীট জংশনে। শব্দ শুনে সে চকিত হয়েছিল, কিন্তু চেতনায় ফিরতে পারে নি। বারেকের জন্য মাথা তুলে আবার ঢুলে পড়েছিল।

চেতনা হল বাগবাজার স্ট্রীটে বোসেদের বাড়িতে আশ্রয় পাবার পর। সেও কিছুক্ষণের জন্য ; তাকে দেখে—তার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করে তারা উদ্ধার-কর্তারা তাকে একটি ঘরে অল্প কয়েকজন মহিলার সঙ্গেই রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা গেলেন ভিতর পর্যন্ত, তাঁদের দিকে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে। সেই তাকাবার সময় আর একবার চোখ পড়ল ওই মলিন লোকটির উপর। আবার একবার পড়ল—যখন ডাক্তার এসে তাকে দেখলেন তখন।

তারপর সারারাত ধরে সে ঘুমিয়েছিল।

॥ দুই ॥

পরের দিন সকালে।—

ঘুম ভাঙবার ঠিক সূক্ষ্মতম মুহূর্তটিতেই আশ্চর্য কোন কারণে আরতির প্রথম মনে পড়ে গেল ওই মানুষটিকে। তারপর মানুষটির সূত্র ধরে লরী, লরীর সহযাত্রী-যাত্রিনী, তারপরই যেন একটা বড় ঝাঁপ দিয়ে অনেক ঘটনা পার হয়ে মনে পড়ে গেল দুর্যোগের কটি দিনরাত্রি অথবা দুর্যোগের সেই দিনরাত্রির অতীত একটা বিভীষিকাময় কালকে। বউবাজারের গলির সেই বাড়ি।

দুর্যোগের অবসান হয়েছে। সে একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আঃ।

আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই মানুষটিকে। ওই ভেঙেপড়া ঘরের কোণে পড়ে-থাকা—ময়লায় আচ্ছন্ন গেবে-যাওয়া একটা আংটির মতই মনে হল তার। হয়তো পিতলের হয়তো তামার—নয় তো গিল্টীর; কিন্তু তবু এক অজানা কারণে মনের চোখ বারবার আংটিটার দিকেই ফিরছে।

কোথায় কী আছে মানুষটির মধ্যে! মনের ঘরের কোন কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে হঠাৎ যেন টান পড়ে পড়ে যাচ্ছে! লোকটার পোশাকে পরিচ্ছদে মোটর ড্রাইভারী বা মোটর মেরামতের কারখানার কিছু সংস্রব আছে। পরনে ছিল খাকী ফুল প্যান্ট, খাকী হাফ-হাতা শার্ট; হাতে ছিল একটা মোটরের স্টার্টিং হ্যাণ্ডেল বারবার হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে।

চিন্তায় বাধা পড়ল। ভলেন্টিয়াররা মাটির ভাঁড় আর একটা বড় কেটলি নিয়ে চা দিতে এসেছে। উঠানে বারান্দায় কলরব উঠছে। দুর্যোগ পার হয়ে একরাত্রি এই নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করে জীবন এরই মধ্যে অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। পাথর চাপা-পড়া ঘাস যেমন পাথর সরে গেলে আলো-বাতাসে মুহূর্তে মুহূর্তে সজীব হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে বেঁচে উঠছে মানুষ।

ভাঁড়ে চা আরতি বহুকাল আগে খেয়েছে। ওই মামার বাড়ি যাওয়ার সময় রেলপথে স্টেশনে খেয়েছে। বর্ধমান থেকে হাওড়া পর্যন্ত স্টেশনে স্টেশনে ভাঁড়ের চায়ের কারবারটা জোর চলে। কিন্তু সেও অনেকদিনের কথা। আরতির মাতামহীর মৃত্যুর পর থেকেই সে যাওয়া-আসাও বন্ধ হয়েছে। মামারা কেউ কলকাতায়, কেউ দিল্লীতে—কেউ বম্বেতে বাস করছেন। মামার বাড়ি শেষ সে যখন যায়, তখন তার বয়স চৌদ্দ-পনের বছর। সে আজ বারো বছর আগের কথা। ভাঁড়ে চা বোধ হয় তারপর আর খায় নি। তবুও আজ বেশ লাগল। জানলার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, একটা উনোনে হাঁড়িতে জল গরম হচ্ছে এবং সেই জল আর একটা বড় হাঁড়িতে ঢেলে প্যাকেট প্যাকেট গুঁড়ো চা ঢেলে দিয়ে পাইকারী হারে চা হচ্ছে। গুঁড়ো চায়ের একটা গন্ধ আছে। হাঁড়িতে গরম জলের মধ্যেও অন্তত হাঁড়ির গন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু সেসব কিছুই যেন টের পেলে না। বরং তৃপ্তি করে ভাঁড়ের চাটুকু শেষ করে বললে, “আর একটু দেবেন ত!”

"নমস্কার! আপনাদের নাম-ঠিকানা, গার্জেনের নাম, কাকে কাকে পাচ্ছেন না, আর কলকাতায় কোন নিকট-আত্মীয়স্বজন আছেন কি না—যেখানে গেলে আশ্রয় পেতে পারেন, এইগুলি বলতে হবে।"

তিনজন ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। আরতি একজনকে চেনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নামকরা গান্ধীভক্ত। আর দুজনের একজন কোন সম্পন্ন ঘরের সন্তান। বাকী একজন বোধ করি পাড়ার সেই সব ছেলেদের একজন, যারা সাধারণ সময়ে রোয়াকে বসে আড্ডা দেয়, চায়ের দোকানে তকরার করে, এবং যে-কোন হৈ-চৈ হলেই সেখানে ছুটে যায়। কালকের সেই লোকটির দোসর কেউ হবে!

আবার কালকের সেই লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। কলকাতার হাজার হাজার মোটর-ড্রাইভার, মোটর-মিস্ত্রীদের কেউ!

তাদের এককালে মোটর ছিল; তার ড্রাইভার বরাবর একজনই ছিল—বুড়ো বচ্চন সিং। বৃদ্ধ শিখ। এ-লোকটি হিন্দুস্থানী; নয়তো বাঙালী! তার মনের চিন্তাকে খণ্ডিত করে প্রফেসর ঘোষ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "তুমি—তুমি আরতি না? ইউনিভারসিটিতে ইকনমিক্সএর ক্লাসে—?"

আরতির মুখে এবার একটু স্মিত এবং সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। সে হাতজোড় করে নমস্কার করতে গিয়ে হঠাৎ উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সামনেই দাঁড়াল।

সবিস্ময়ে প্রফেসর ঘোষ বললেন, "তুমি? মানে তোমরাও আটকে পড়েছিলে নাকি? তোমাদের ত নিজেদের বাড়ি। অন্তত তা-ই শুনতাম ইউনিভারসিটিতে।"

"হ্যাঁ, আমাদেরই বাড়ি। বউবাজারের কপালিটোলা লেনের কাছে।"

"সর্বনাশ! সে তো একেবারে ভয়ানক জায়গা। লুঠটুট হয়েছে নাকি?"

আরতি মৃদুস্বরে বললে—"এক রাত্রি একদিন লুঠ হয়েছে। যা নিয়ে যেতে পারে নি তা নিচের উঠোনে জড়ো করে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। চার-পাঁচজন খুন হয়ে পড়ে আছে দেখে এসেছি। আমার এক বুড়ী ঠাকুমা—বাবার পিসীমা—"

আরতির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, চেখে ফেটে দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল। আর সে আত্মসংবরণ করতে পারল না।

অধ্যাপক ঘোষ তার মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, "কেঁদো না। বেঁচে যখন গেছ, কিন্তু—কিন্তু তোমায়—তোমায় মানে—I mean মারধোর করে নি তো?"

আরতির কপালে কয়েকটা ছড়ে যাওয়ার দাগ দেখে তিনি শিউরে উঠলেন! তাঁর শেষের কথা কটা বলবার সময় কণ্ঠস্বরে নিদারুণ আতঙ্ক ফুটে উঠল।

সুকৌশলে প্রফেসর ঘোষ যে প্রশ্ন তাকে করেছিলেন, সে আরতি বুঝেছিল। সে ঘাড় নেড়ে জানালে, "না।"

প্রফেসর ঘোষ তবুও আবার বললেন, "লজ্জার এ সময় নয়।

মানে অত্যাচার হয়ে থাকলে তার দুটো প্রতিকার প্রয়োজন, তার যেটা প্রাথমিক, সেটা চিকিৎসা। নয় কি ?"

আরতি আবার ঘাড় নেড়েই বললে, "না। আমাকে ওরা খুঁজে পায় নি। আমি প্রথমেই ছাদে উঠেছিলাম। ছাদের কোণে কতকগুলো পুরনো জলের ট্যাঙ্ক ডাঁই করা ছিল। আমি তারই সকলের তলাটার মধ্যে ঢুকেছিলাম। ঢুকতেই উপরের গুলো হুড়মুড় করে চারিপাশে পড়ে আমার চারিপাশটা দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল। ওরা উপরের কতকগুলো খুঁজে কিছু না পেয়ে ভিতরের দিকে এগোয় নি। আমি তিনদিন সেই তারই মধ্যে ছিলাম।"

প্রফেসর ঘোষ আবার একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটু হেসে বললেন, "আমারই ভুল। তোমাকে পেলে—তোমাকে ওরা ছেড়ে যেত না।"

আরতি শিউরে উঠল। ওদের বাড়ির ভাড়াটেদের তিনটি তরুণী বউ, পাঁচটি যুবতী মেয়ে, তারা ত কেউ আসে নি! মনে পড়ে গেল —সামনের তেতলা বাড়িটার সেই যুবতী বধূটির সেই গোঙানি ?

"কিন্তু তুমি এখন যাবে কোথায় ? ও-বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা এখন ভুলে যাও। এখানকার অবস্থা ত দেখছ। তুমি কি এখানে থাকতে পারবে ?"

সঙ্গের ভদ্রলোকটি এবার কথা বললেন, "বিপদের কথা নিশ্চয় স্বতন্ত্র। থাকতেই হয়। কিন্তু কলকাতার কোন নিরাপদ এলাকায় কোন আত্মীয়স্বজন নেই আপনার ?"

প্রফেসর ঘোষ বললেন, "আত্মীয় না থাক, তোমার বন্ধু-বান্ধবও

ত অনেক আছে! কারও বাড়ি গিয়ে থাক এখন। এখানে অসুবিধা! আমি ত জানি, এ ঠিক সহ্য করতে পারবে না তুমি।”

তারপরই সঙ্গী ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে বললেন, “ওঁর জন্যে ভাবতে হবে না। আরতির অনেক বন্ধু-বান্ধব! আরতি তুমি ঠিক কর কোথায় যাবে। আজই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। এর মধ্যে ত তুমি থাকতে পারবে না!”

আরতির কানের পাশ দুটো গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। গায়ের রং ফরসা হলে বোধ হয় টুকটুকে রাঙা হয়ে উঠত। আরতির সৌভাগ্য যে তার রং ময়লা। ইউনিভারসিটিতে সে-সময় ছেলেরা তার আড়ালে তাকে লেডি কালিন্দী বলে ডাকত।

“ওঁর জন্যে ভাবতে হবে না। আরতির অনেক বন্ধু-বান্ধব।”

“এর মধ্যে তো তুমি থাকতে পারবে না!”

কথা কটা আরতির কানের কাছে যেন বেজে চলেছে। তারই জন্যে কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠেছে তার। প্রফেসর ঘোষ যেন খোঁচা দিয়ে কথাটা বললেন। তবু কথাগুলি সত্য। সে অস্বীকার করে না আরতি। কিন্তু খোঁচাটা না দিলেই আরতি সুখী হত।

গান্ধীবাদী অধ্যাপক! মতবাদ শতকরা নিরেনব্বুই জনকে মুক্তি দেয় না, নতুন ক'রে বন্ধনে বাঁধে। জীবনের শিক্ষা—সহজ স্বভাব সব কিছুকে ব্যর্থ করে একটা গোঁড়া মতবাদান্ধ মানুষে

পরিণত করে। নইলে বিজ্ঞানের অধ্যাপকটি গান্ধীবাদী হয়ে এমন আধুনিকতা বিরোধী হয়ে উঠতেন না। আরতির আধুনিকতার জন্যই অধ্যাপক ঘোষ খোঁচা দিলেন। গান্ধীবাদীদের জন্যই আধুনিকতাকে প্রফেসর ঘোষ পছন্দ করেন না। আধুনিক কালে যা সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে জন্মায়, তা-ই উল্লসিত-বর্ধনে বাড়ে, তা-ই দ্রুততম গতিতে ছোটে। যা পুরনো, তা-ই মন্থর, তা-ই স্থবির, তা-ই বিষণ্ণ, তা-ই মলিন। তবুও নূতনকে আধুনিককে পুরাতনীরা চিরকাল এইভাবে পছন্দ করে না। ওঁরা অর্থাৎ পুরাতনীরা নিজেদের বলেন সনাতনী। অর্থাৎ ওঁরাই সকল কালে সত্য এবং স্থির। বর্তমানের দখলেই তাঁরা তুষ্ট হন না—ভবিষ্যতেও ডিক্রী জারী করে রাখেন। ইংরেজ-রাজত্ব চলে যাচ্ছে, এ সত্য চোখে দেখেও ঘোষ তা ভাবতে পারছেন না এবং আরতির ইতিহাসও তিনি জানেন না। এয়ার রেডে লণ্ডনে ভাই মারা গেছে। এখানে তার বাবা মারা গেছেন ১৯৪২ সালে ২৪শে ডিসেম্বর, এয়ার রেডের রাত্রে আতঙ্কে। ঘোষ এসব জানেন না হয়তো।

একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

অধ্যাপক ঘোষ বললেন—"এখানে তুমি ত থাকতে পারবে না।" তাও সত্য কিন্তু ওতেও খোঁচা আছে। ইউনিভার্সিটিতে সে সময় তার চেয়ে স্টাইলে মডার্ণ কেউ ছিল না।

আরতির বাবা যে ছিলেন পুরোপুরি মডার্ণ। সেকালে এম-এ পাশ করেও চাকরি খোঁজেন নি। ব্যবসায়ে নেমেছিলেন, ব্যবসায়ে

অনেক উপার্জন করেছেন, অনেক লোকসান দিয়েছেন, অনেক খরচ করেছেন। এক ছেলে এক মেয়ে—রথীন আর আরতি। রথীনকে ছেলেবেলা থেকেই পড়তে দিয়েছিলেন সেণ্ট জেভিয়াসে´, তারপর শিবপুর বি-ই কলেজে; সেখান থেকে পড়া শেষ করে গিয়েছিল বিলেত। আরতিকে প্রথম দিয়েছিলেন লরেটোতে, তারপর ডায়োসেশনে। আরতির জন্ম এই কপালিটোলার বাড়িতেই। তখন বাড়িটায় কোন ভাড়াটে ছিল না। গোটা বাড়িটাই সাহেবি ঢঙে আধুনিকতম স্বাচ্ছন্দ্য এবং সজ্জায় সাজানো ছিল। জন্ম থেকে আরতি খাবারঘরে দেখেছে টেবিল-চেয়ার। মধ্যে মধ্যে ছেলেবেলায় মামার বাড়ি গিয়ে পুরনো কালের ধারাধরনের মধ্যে অসুবিধায় পড়ত। দাদা রথীন কোন কালেই মামারবাড়ি যেত না। তার মামারাও আধুনিক-পন্থী কিন্তু পৈতৃক দেবত্র সম্পত্তির টানে তাঁরা আজও গ্রামের সঙ্গে বাঁধা আছেন; পূজোপার্বণ আচারবিচার বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তার বাবার ওই বন্ধন ছিল না। তিনি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, পড়াশুনোয় ভাল ছিলেন বলে সম্পত্তিবান ব্যবসায়ীর ঘরে বিয়ে করেছিলেন। সেই সূত্রে ব্যবসায়ে নেমেই পৈতৃক জমিজিরাত যা ছিল সব বিক্রী করে দিয়ে মুক্তি নিয়েছিলেন। এবং আধুনিকতাপন্থী শ্বশুরবাড়িকে ছাড়িয়ে সত্যকারের আধুনিক হয়েছিলেন। বিদেশের বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। আরতির জন্মের আগে, আরতি শুনেছে—প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই তখনকার ইংরেজ আমলের কোল-কণ্ট্রোলার, মাইনিং-ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতিরা তার বাবাকে খুব

ভালবাসতেন। তাঁদের ফটোগ্রাফ দু একখানা এখনও বাড়ির দেওয়ালে ঝোলে। তাদের বাড়িতে তাঁরা নেমন্তন্ন পর্যন্ত খেতে আসতেন মেমসাহেবদের নিয়ে। অবশ্য হোটেল থেকে লোক এসে সার্ভ করত। তার সঙ্গে থাকত তার মায়ের কিছু দিশী রান্না। অনেকে এর জন্যে অনেক নিন্দে করেছে, কিন্তু তার বাবা কোন দিন গ্রাহ্য করেন নি। তিনি মুখের উপর বলতেন, "Please, Please, ওসব কথা বলবেন না আমাকে। আমি মূর্খ নই। আমার ফ্রাস্ট্রেশনের হেতু নেই, আমি গড্ডলিকাপ্রবাহের মানুষ নই, বুড়ো গরু-টানা একখানি গো-যান নই, আমি সস্তা জনপ্রিয়তার ভিক্ষুক নই, আমি ইতিহাস জানি, আমি সে ইতিহাসের স্বরূপ নিজের চোখেই দেখেছি, এই কালেই দেখেছি। বাঙালী জাত মেছোর জাত, আর চাষার জাত। মাছ-ভাত খাদ্য; একফালি লেংটি বস্ত্র; আর পরকীয়া সাধন তার আধ্যাত্মিকতা, ওই রসের গান তার সাহিত্য। খোল বাজিয়ে ধেই ধেই করে নাচ তার নাট্যকলা। ওই কালীঘাটের পট তার শিল্পকলা। মাটির ভাঁড় আর খুরি তার তৈজস। খড়ের চালের মাটির কুঁড়ে এবং পূর্ববঙ্গে ছিটে বেড়ার ঘর তার স্থাপত্য। খড়েবাঁশেকাঠে আটচালা করে ষড়দলে লেখে-যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ভাগ্যে ইংরাজ এসেছিল। তাদের সংস্পর্শে এসে ইংরিজী শিখে জাতটা বাঁচল। ওই ব্রাহ্মরা ভাগ্যে ইংরিজী শিখেছিল, আর হিন্দু সমাজ থেকে কেটে বেরিয়েছিল, তাই রবি ঠাকুরকে পেয়েছে। নইলে ইংরিজী শিখেও ধর্মের টানে বঙ্কিমেই খতম হত পালা।"

তারপরই বলতেন, "আবার এসেছে এই এক গান্ধী। গুজরাটি বুদ্ধ। দেশটাকে একেবারে কপনি পরিয়ে ছাড়বে। বঙ্কিম করেছিল —মা, মা। এ করছে—রাম রাম! শেষ পর্যন্ত দেশের এনার্জিকে রাম নাম সত্ হায় হাঁক দিয়ে নিমতলায় পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।"

এই ধরনের উক্তির পরে সমালোচকেরা স্তম্ভিত হয়ে যেত। কোন পূজোতে তিনি চাঁদা দিতেন না। তাঁর দম্ভ এবং আদর্শ বজায় রাখবার সঙ্গতি তাঁর ছিল। সে দুদিক দিয়েই। অর্থের দিক দিয়ে তো বটেই, মনের দিক থেকেও। ভেঙে গিয়েছিলেন শেষ দিকটায়, আকস্মিক আঘাতে। উনিশ শো চল্লিশের শেষ দিকে। আরতির মা তখন মারা গেছেন। রথীন বিলেতে। যুদ্ধ লাগল। তার বহুদিন আগে থেকে তিনি জাপানীদের সহযোগিতায় এখানে কাঁচা লোহা তৈরীর একটা বড় প্রচেষ্টায় নেমেছিলেন। জাপানীরা যুদ্ধে নামবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচেষ্টায় একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। বলতে গেলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। অথচ তখন তাঁর অবস্থা একেবারে সমৃদ্ধির চরমে ; হু হু ক'রে ফাঁপছেন। এ বাড়ি ছাড়াও আরও তিনখানা বাড়ি করেছেন। একটা ব্যাঙ্ক করেছেন। জাপানীদের সঙ্গে মিলে করা কারখানাটা বন্ধ হ'তেই তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যাঙ্কটা ফেল পড়ল। জাপানী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে। রেঙ্গুন পড়েছিল ১৯৪২-এর মার্চ মাসে। তার আগেই যুদ্ধের চেয়েও দ্রুতগতিতে ঘটনাগুলো ঘটে গেল। ব্যাঙ্ক ফেল পড়েই শেষ হল না, তার দায়ে তার বাবা য়্যারেস্টেড হলেন। নতুন তিনখানি বাড়ি বিক্রী করে বাবা মুক্ত হলেন সর্বস্বান্ত হয়ে।

আরতি এই সময়টাতেই ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছে। এই সময়কার কথা তুলেই প্রফেসর ঘোষ তাকে খোঁচা দিয়ে কথাটা বললেন, "এর মধ্যে তো তুমি থাকতে পারবে না!"

তার কারণ কালো মেয়ে আরতি ইউনিভারসিটিতে ঢুকত তার রূপসজ্জার অপরূপত্বে এবং অভিনবত্বে সকল মেয়েকে ম্লান করে দিয়ে, এবং তার ব্যক্তিত্বে ও গাম্ভীর্যে ছাত্রছাত্রী সকলকেই বেশ একটু ত্রস্ত করে তুলে। তার সাজ-সজ্জায় উপকরণের প্রাচুর্য ছিল না, বরং কমই ছিল। কিন্তু আশ্চর্য রকমের আকর্ষণ ছিল তার সেই স্বল্প পরিচ্ছন্ন উপকরণের সজ্জায়। গলায় একছড়া মুক্তোর ছোট হার, কানে দুটি দুল ছাড়া আর কোন গহনা সে পরত না। কিন্তু শ্যাম্পু করা চুলে, মিহি সাদা রেশমী শাড়ি-ব্লাউসে, পাউডারের অতি সূক্ষ্ম প্রলেপ মাখা মুখে, ও চোখে ঈষৎ নীলাভ রিমলেস চশমায় মেয়েটিকে অত্যন্ত বিলাসিনী মনে হত। কাপড়ের জমিটাই শুধু সাদা নয়, কাপড়টার সবটাই সাদা, কোন পাড় পর্যন্ত থাকত না। চলত ফিরত একটু অলস ভঙ্গিমায়। কারও সঙ্গেই প্রায় কথা বলত না। ছেলেদের সঙ্গে ত নয়ই। অথচ সকলেই যেন অনুভব করত যে, এর মধ্যে ওর একটা খেলা রয়েছে। কিন্তু কেউ জানত না তার আসল কারণটা কী। বাবার অবস্থার বিপর্যয়ের পর আরতি সাজতে ভালবাসত না। গহনা তখন ব্যাঙ্কে বাঁধা রয়েছে। বাড়ি বিক্রীর টাকায় দেনা শোধ হয়েছে, কিন্তু বাবাকে বলতে পারে নি, বাবা, গহনাগুলি ছাড়িয়ে আনো। চুল শ্যাম্পু করায় সে আজীবন অভ্যস্ত; কাপড়-চোপড় তাই সবই ওই ধরনের। সুতরাং

তাকে নিয়ে যে ফিস্‌ফিসানি উঠেছিল, তাতে তার রাগের চেয়ে দুঃখই হত বেশী। ছেলেদের মহলে অনেকের ধারণা ছিল, সে ক্রীশ্চান। তাদের কেউ কেউ তাদের কপালিটোলার বাড়ি পর্যন্ত তার পশ্চাদনুসরণ করে—ফিরিঙ্গীপাড়ায় বাড়ি দেখে ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। তাতে তার হাসিই পেয়েছিল। হায় রে হিন্দু ধর্ম! শেষ পর্যন্ত তেলমাখা চকচকে চুলে, পাড়ওয়ালা শাড়িতে, আর মুখ নামিয়ে-চলায় তোমার স্থিতি নির্ধারিত হল! তার ঘেন্না হত! তার নাম তারা অনেক দিয়েছিল। মিস চালিয়াৎ! একদিন একটা কাগজ তার গায়ে এসে পড়েছিল। তাতে লেখা ছিল, 'তোমার নাম কি শ্যামলী?' মধ্যে মধ্যে এক কলি গান পিছন থেকে ভেসে আসত, 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।' এগুলো সে গ্রাহ্য করত না। হঠাৎ একদিন শুনলে সে, কেউ বলে উঠল, লেডি কালিন্দী! সে ফিরে তাকিয়ে কাছাকাছি কাউকে দেখতে পায় নি। একস্তর সিঁড়ির নিচে একদল ছেলে কলরব করছিল। রাগ তার সেইদিন হয়েছিল। একদল ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল। অন্যভাবে। ভদ্রভাবে। তারা রাজনীতি করত। তারা চেয়েছিল তাকে দলে টানতে। কিন্তু সেও তারা পারে নি।

হঠাৎ একদিন তার সমস্ত সহ্যশক্তির আবরণটা ভিতরের বিস্ফোরণে ফেটে চৌচির হয়ে গেল; উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন আধা-স্ট্রাইক গোছের কী একটা হয়েছিল; ছেলেমেয়েরা

প্রায় অধিকাংশই অনুপস্থিত সেদিন, আরতি লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে নিচে নামছিল। লিফ্‌টটা ছিল বিকল। সিঁড়ির একটা মোড়ের চাতালে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। আরতি দেখলে, তাকে দেখে তাদের মধ্যে একটা দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল। দুজনের মুখেই একটু চকিত হাসি খেলে গেল। কুঞ্চিত হয়ে উঠল আরতির ভ্রূ; সে নিচের দিকে তাকিয়ে অবনত দৃষ্টিতে পথ চলতে পারে না, সামনের দিকেই দৃষ্টি রেখে দৃঢ় পদক্ষেপে নামতে লাগল। মোড়ের চাতালে পা দেবামাত্র একটি ছেলে হাতের খাতা-বই কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললে, "নমস্কার। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

অগত্যা প্রতিনমস্কার করে আরতি বলেছিল, "বলুন!"

হেসে ছেলেটি বলেছিল, "মানে আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপনিই ত রতি দেবী? রতি সেন?"

মুহূর্তে বিস্ফোরণের মত ক্রোধে সে যেন ফেটে পড়েছিল। কিন্তু চিৎকার করে নি। ছেলেটির হাতের বই এবং খাতাগুলি ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে নামতে শুরু করেছিল। ছেলেটি হতবুদ্ধি হয়ে বোবার মত মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে তার পিছনে ছুটে এসে বলেছিল, "এ কী, আমার বই-খাতা নিলেন কেন? এ কী? দিন!"

"সেক্রেটারীর ঘরে আসুন। সেখানে তাঁর হাত থেকে নেবেন। এর থেকে আপনার নাম, রোল নম্বর, ক্লাস—এ পরিচয় আমি শুনব। এবং আমার নাম-পরিচয়ও আপনাকে বলব।"

তার চলার গতি দ্রুততর হয়ে উঠেছিল আপনা-আপনি।

"শুনছেন? শুনুন! শুনুন!"

উত্তর দেয় নি আরতি।

"মাপ করুন আমাকে। শুনছেন!"

এরও উত্তর না দিয়ে আরতি সিঁড়ি নেমেই চলেছিল। পিছনের দিকেও ফিরে তাকায় নি।

"আর কখনও—"

"কী হয়েছে? কী ব্যাপার?"

ঠিক পরের চাতালটায় সিঁড়ির মোড়ে প্রফেসর ঘোষ প্রশ্ন করেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই তিনিও বিপরীত মুখে মোড় ফিরে আরতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন থমকে। নিচে থেকে উঠবার সময় এদের কথাগুলি তাঁর কানে গিয়েছিল। হয়তো বা খানিকটা তিনি দেখেও ছিলেন।

আরতি হাঁপাচ্ছিল উত্তেজনায়। কানের পাশ দুটো আজকের মতই ঝাঁ ঝাঁ করছিল। যথাসাধ্য আত্মসংবরণ করে সে বলেছিল, "আমি সেক্রেটারীর কাছে ওঁর নামে কম্‌প্লেন করতে যাচ্ছি।"

ইচ্ছে হয়েছিল এগিয়ে চলে যাবার। এই গান্ধীবাদী, মিষ্টিমুখ আপসপন্থী লোকটিকে তার খুব ভাল লাগত না কোন কালেই। কিন্তু প্রফেসার ঘোষই বলেছিলেন, "কী হয়েছে, আমাকে বলতে পার না? সেক্রেটারী নেই; এই এখুনি ওদিক দিয়ে ভাইস্‌ চ্যান্সেলারের সঙ্গে চলে গেলেন।"

"আর স্যার শুধু নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এবং তার জন্যও আমি বারবার মাপ চাইছি।"

"চুপ কর তুমি। আগে ওঁর কাছে শুনব আমি। অবশ্য উনি যদি বলেন।"

আরতি একবার ঠোঁট কামড়ে ধরে আত্মসংবরণ করেছিল; বলতে চেয়েছিল—'না, যা বলবার সেক্রেটারীর কাছেই বলব।' কিন্তু সে কথাটাকে ঠোঁটের মুখে আটকে নিয়ে বলেছিল, "আমার নাম আরতি! উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন নিরীহভাবে—আপনার নাম জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপনিই ত রতি দেবী? তাই আমি ওঁর খাতা-বই কেড়ে নিয়ে সেক্রেটারীর কাছে যাচ্ছি।"

প্রফেসর ঘোষেরও মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। রূঢ় কিন্তু নিম্নকণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, "ছাত্রদের কলঙ্ক তুমি! এত বড় লজ্জার কথা আর হয় না।"

ছেলেটি আর দাঁড়াতে পারে নি শক্ত হয়ে, ভেঙ্গে পড়েছিল মুহূর্তে। টপটপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরতে শুরু করেছিল। কথা বলতে চেষ্টা করেও পারে নি। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপছিল অবলার মত।

আরতি এবার তার খাতা-বই তার হাতে দিয়ে বলেছিল, "নিন। কিন্তু আর কখনও এমন করে কোন সহপাঠীকে রসিকতা করতে গিয়ে অপমান করবেন না।"

ছেলেটি খাতা-বই পেয়ে মাথা হেঁট করে চলে গেল। আরতিও ফিরল। কিন্তু প্রফেসার ঘোষ তাকে ডেকে বলেছিলেন, "তুমি

দাঁড়াও। চল, আমি তোমাকে বাসে বা ট্রামে কিসে যাবে, পৌঁছে দিয়ে আসি।"

এবং সঙ্গে সঙ্গেই নামতে শুরু করেছিলেন। নামতে নামতেই বলেছিলেন, "তোমাকে একটা কথা বলব। মিষ্টি কথা না হতে পারে কিন্তু—ভুল বুঝো না যেন আমাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসেছিলেন। বোধ করি রূঢ় কথা মোলায়েম করবার জন্য, কুইনিনের উপর কোটিংয়ের মিষ্টির মত মিষ্টি হাসি।

আরতি বলেছিল, "বলুন।"

"তুমি এত অমিশুক কেন? তোমার সঙ্গে যারা পড়ে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর না কেন? এবং বেশভূষায় আর একটু সহজ, মানে—আমাদের দেশের মত হতে পার না? আর একটু সোবার? এ নিয়ে অনেক কথা কানে আসে। সেজন্যই আমি বলছি।"

আরতি বলেছিল, "আমার উপর রাগ করবেন না স্যার, আমি এখানে পড়তে এসেছি, বন্ধুত্বের আসর জমাতে আসি নি। আমার বন্ধু-বান্ধবী অনেক আছে। এবং বন্ধু হতে গেলে যে সহৃদয়তার প্রয়োজন তা এখানে কারুর আছে বলে মনে করি নে। সেইজন্যেই বলি, আর নূতন বন্ধু-বান্ধবীর আমার প্রয়োজন নেই। আর আমার এই বেশভূষাতেই আমি ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত। একে আমি আনসোবার বলেও মনে করি নে!"

বলেই বেশ একটু দ্রুতগতিতে প্রফেসর ঘোষকে পিছনে ফেলে চলে যেতে চেষ্টা করেছিল। প্রফেসর ঘোষ বোধ করি এর পর আর তার সঙ্গে যেতে চান নি; ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়েছিলেন।

এর পর এক সপ্তাহের মধ্যে—।

তার চিন্তা সূত্র ছিন্ন করে দিলেন অধ্যাপক ঘোষ। প্রশ্ন করলেন—"কিছু ঠিক করেছ? কোথায় তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে বল ত?" আরতির মনে পড়ল সে আজ দাঙ্গার পর নিরাশ্রয় হয়ে বাগবাজারে এক মুসাফিরখানার মত কোন স্থানে বসে আছে।

অধ্যাপক ঘোষ অপর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ সেরে ঘর থেকে বের হবার মুখে আবার আরতির সামনে দাঁড়ালেন এবং ওই প্রশ্ন করলেন।

আরতির ভুরু কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল একমুহূর্তে। উত্তর দেবার মত চিন্তা করবার অবকাশ সে পায় নি। অনেক অতীতে মন ছড়িয়ে পড়েছিল তার। আজ সে প্রায় সব হারিয়েছে। যা আছে তাও তার নাগালের বাইরে। থাকবার মধ্যে ওই বাড়িটা আর ব্যাঙ্কে কিছু টাকা। তাও চেক্-বই নেই। কাপড়জামা পরনে যা আছে, তাই সব। আত্মীয় তার আছে। আপনার মামাতো ভাইয়েরা। বন্ধু-বান্ধবও আছে। কিন্তু কোথায় গেলে এই একান্ত রিক্ত অবস্থায় সত্যকারের স্নেহ এবং সমাদর পাবে, সূক্ষ্ম হিসেব না করলে তা নির্ণয় করা যায় না। মামাতো ভাইরা আপনজন হলেও তাদের সব প্রীতি-আত্মীয়তা যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

কাল যুদ্ধ! পৃথিবীজোড়া বাইরের ধ্বংসলীলাই তার একমাত্র অভিশাপ নয়; নাগাসাকি-হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া বায়ুস্তরেই শুধু বিষ ছড়িয়ে ক্ষান্ত হয় নি, মানুষের

মনোলোকে যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, তার জ্বালায়-জর্জরতায় সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে! যুদ্ধের মধ্যে তার মামাতো ভাইয়েরা কোন সক্রিয় রাজনীতি করে নি, করার মত যোগ্যতাও তাদের ছিল না, তারা প্রথম যৌবন থেকেই মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত। কিন্তু যুদ্ধের গোড়া থেকেই তারা ওয়ার কণ্ট্রাক্ট খুঁজেছে, পেয়েছেও, ইংরেজের খয়েরখাঁ-গিরি করেছে, কিন্তু দেশপ্রেমের ও স্বাধীনতা কামনার মনোবিলাসে যুদ্ধের গোড়া থেকেই জার্মানীকে সমর্থন করেছে; তারপর জাপান যোগ দিলে ত তাদের এগিয়ে বাড়ির মধ্যে উল্লাস প্রকাশের সীমা ছিল না। তারও পরে নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র এই যুদ্ধ-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতেই, এই সব মনে-মনে-শৌখিন-বিপ্লবীরা—ঘরের মধ্যে ব'সে ইচ্ছা দিয়ে এই পক্ষকে সমর্থনে সবাক আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়—নানান মিথ্যাগল্প ক'রে বন্ধু-বান্ধবের কাছে বাহবা কুড়িয়েছে। অন্যদিকে তার দাদা রথীন মারা গেল লণ্ডনে জার্মান বোমায়। সেই আঘাতে সেরিব্রেল থ্রম্বসিস হয়ে আরতির বাবার ডান দিকটায় হল প্যারালিসিস। এখানেই শেষ নয়। তার পরই বিয়াল্লিশ সনের ডিসেম্বরের চব্বিশে ডালহৌসি স্কোয়ারে জাপানী এয়ার রেডের রাত্রে আতঙ্কে তিনি মারা গেলেন। এর ফলে আরতি হয়ে উঠল জাপান, জার্মানী এবং তাদের সঙ্গে আছেন বলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও ঘোরতর বিরোধী। প্রায় গোটা দেশেরই তখন থেকে আজও পর্যন্ত এমনি অবস্থা। নানান রাজনৈতিক দলের প্রভাবে একটি বাড়ির মধ্যেই হয়তো চারটি ছেলে চার রকম মতবাদে পরস্পরের বিরোধী।

মর্মান্তিক আঘাতে আরতির বিদ্বেষের তীব্রতার আর সীমা ছিল না। সেই তীব্রতায় সে মামাতো ভাইদের সঙ্গে মামার বাড়ির সংস্পর্শও প্রায় ত্যাগ করেছে। একজন ভাইয়ের তার বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ। এই মহা দুর্যোগের মধ্যেও সেখানে যাবার কথা ভাবতে পারছে না আরতি। বন্ধুবান্ধবের কথা মনে করতে গিয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে তাদেরই কথা, যারা তার ভাবেই ভাবিত। কিন্তু তাদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। তার মতামত যাই হোক না, নিজের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাকে খর্ব করে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সে আজও জড়িত হয়নি। তবু তাদের ওখানে যেতেও মন সায় দিচ্ছে না।

প্রফেসর ঘোষ আরতির চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন,—"ঠিক করে উঠতে পার নি? আচ্ছা—ও-বেলা পর্যন্ত ভেবে ঠিক কর। তোমার কাপড়-চোপড় ত কিছু নেই! চাই ত?"

"না। ঠিক করেছি। আমার এক মামা থাকেন এখানেই, বালীগঞ্জে, মনোহরপুকুর রোডে। আমি সেখানেই যাব।"

"তাহলে ত নিশ্চিন্ত। ঠিকানাটা বল ত? টেলিফোন থাকলে এখুনি খবর দিয়ে দিচ্ছি। তাঁরা এসে পড়বেন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে আরতি বললে, "না। এতখানি হয়তো তাঁরা পারবেন না। আমাকে অনুগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন না?"

প্রফেসর ঘোষ সঙ্গের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালেন, "কেশব ভাই—"

সৌম্যদর্শন কেশববাবু বললেন, "ব্যবস্থা করছি। গাড়ি চাই। ও-বেলা মানে তিনটে পর্যন্ত বোধ হয় পারব। গাড়ি পেলেও মুস্কিল হচ্ছে ড্রাইভারের। নার্ভাস ভীতু লোক দিয়ে ত হবে না। মাধব বা রতন, ওদের দুজনের কেউ হলে ভাল হয়। রতন হলে আবার সঙ্গে লোক চাই। হাজার হলেও মিস্ত্রী ক্লাসের লোক। ভাল জানি না। নতুন। তবু তিনটে পর্যন্ত হবে বলেই মনে করি।"

"আমার জন্যে একজোড়া কাপড় আর জামাটামা চাই। এইটে—।"

গলা থেকে লকেট সমেত একছড়া সরু হার খুলে দিয়ে বললে, "এইটে বিক্রী করে বোধ হয় হয়ে যাবে।"

"আমাদের ফাণ্ড রয়েছে।"

বাধা দিয়ে হেসেই আরতি বললে, আমার ভাগ্যক্রমে ব্যাঙ্কে কিছু রয়েছে। ঘরে যা ছিল গয়না টাকা কাপড় গেলেও সব যায় নি। আপনাদের অনেক জনের জন্যে অনেক করতে হবে। আমারও একখানা কাপড় আর একটা জামায় চলবে না। আরও খরচ আছে। বিক্রী ত আমাকে করতেই হবে।"

প্রফেসর ঘোষ হাত পেতে বললেন, "দাও।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়িটার সিঁড়ির সামনে। নামলেন একটি খাকী পোশাক পরা সবলকায় ভদ্রলোক।

"দাদা!"

"মাধব!" সাড়া দিলেন প্রফেসর ঘোষের সঙ্গী।

মাধব এসে দাঁড়ালেন। আরতি চিনতে পারলে এই ভদ্রলোকই কালকের উদ্ধারকারী দলের কর্তা ছিলেন ও গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

"কাল রাত্রে সাদা রঙের ক্যাডিল্যাকখানার কথা গুজব নয়, সত্যি। নিকিরীপাড়ার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। রতন দেখেছে নিজের চোখে।"

বলেই তিনি ডাকলেন, "রতন!"

প্রফেসর ঘোষ বোধ করি কথাটা ধরতে পারেন নি, তিনি প্রশ্ন করলেন, "সাদা ক্যাডিল্যাক?"

"সুরাবর্দীর একখানা সাদা ক্যাডিল্যাক আছে। লোকে বলছে এখনো—" কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে গেলেন তাঁরা। অর্থাৎ সুরাবর্দী কাল রাত্রে নিজে নিকিরীপাড়া এসেছিলেন! হয়তো বা নিকিরীদের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে অথবা প্রতিশোধাত্মক কিছু করবার উদ্দেশ্য নিয়ে;—যে উদ্দেশ্য নিয়েই আসুন এদের চিন্তিত হবার কারণ আছে।

আরতি জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। নিকিরী-পাড়া কথাটা তার মাথায় সাড়া জাগিয়েছে। নিরীহ নিকিরীদের এ-পাড়ায় নাকি নিষ্ঠুর প্রতিশোধের আক্রোশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। দা, লাঠি, ঢেলা, যে যা পেয়েছে—তাই দিয়ে আক্রমণ করেছে, গোটা নিকিরী বস্তিটাতে আগুন লাগিয়ে পাহারা দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টারও বেশী জ্বলেছে

বস্তিটা। কেউ কেউ বলছে নিকিরীরা মসজিদের মধ্যে বস্তির মধ্যে অস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছিল। প্ল্যান মত আক্রমণ হলে তারাও যোগ দিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করত। আজ সত্য মিথ্যা বিচারের উপায় নেই। তবে নিকিরী বস্তিটা এখনও ধোঁয়াচ্ছে। এখনও রাস্তায় নিকিরীদের শব পড়ে আছে। প'চে দুর্গন্ধ উঠছে। আরতি ভাবছিল দোষ দেবে কাকে ?

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে উঠল। বাইরে কে বলছে—"আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর গাড়িটা আমি চিনি।"

আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। ভরাট এবং সবল। যেন কাঁসরের মত। যেন কত চেনা।

উঁকি মারলে সে বাইরে।

কালকের সেই লোকটি !

আশ্চর্য। অদৃশ্য অশরীরীর মত কার অস্তিত্ব তার মনোমণ্ডলে সে যেন অনুভব করছে। কিন্তু তাকে না পারছে দেখতে, না পারছে স্পর্শ করতে, শুধু একটা অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করে তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড অস্থিরতা জেগে উঠেছে। কে ? কে ? কে ?

॥ তিন ॥

হঠাৎ একটা কথা একজনের মুখ চকিতের জন্য মনে পড়ে গেল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা দেশলাইয়ের কাঠি মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে চকিতের জন্য একখানা মুখের খানিকটা দেখিয়ে যেন নিভে গেল। ধূলিমলিন আংটিটার পলকাটা হীরাটার শুধু একটা পলের উপরের ধূলা মালিন্য মুছে গিয়ে আলোকের প্রতিফলনে এক বিন্দু দীপ্তি তীরের মত চোখে এসে পড়ল যেন।

চমকে উঠল আরতি। সমস্ত স্মৃতি-লোকটায় আলোড়ন উঠল। সে? কিন্তু তাও কি হয়? প্রবীর? প্রবীর চ্যাটার্জি—ইঞ্জিনিয়ার; গোঁফ দাড়ি কামানো—পরিচ্ছন্ন শিক্ষিত মানুষ; মিলিটারীতে চাকরী নিয়ে হয়েছিল—ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি! পূর্বরণাঙ্গনে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সে কি হতে পারে—এই অপরিচ্ছন্ন কালি-ঝুলি মাখা—এই সব ঘোষ বোসদের অনুগত ভৃত্যের মত এই মোটর-মিস্ত্রী? না!

তিনটের সময় গাড়ি এল।

বাগবাজারে বন্ধুদের বাড়ি থেকে গাড়িতে উঠে আরতি মামাতো ভাইদের অভ্যর্থনার আশঙ্কাতেই নিজের মধ্যেই সে দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল, ভুলে গেল ওই লোকটির কথা। পৌঁছে দেবার জন্য বন্ধুদের বাড়ি থেকে যিনি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি মাধববাবু। উদ্ধার-কারী দলের নেতা। বিশিষ্ট ঘরের ছেলে। সকালবেলা প্রফেসর

ঘোষের সঙ্গে কেশব বলে যিনি এসেছিলেন, নিঃসংশয়ে তাঁর ভাই। মুখের সাদৃশ্যই সে-কথা বলে দেয়। ওবেলায় কেশববাবুকে দাদা বলেই ডেকেছিলেন। সঙ্গে আর একজন ওঁদেরই কেউ হবেন।

বসুদের বাড়ি থেকে গাড়িখানা গঙ্গার ঘাটের দিকে পথ ধরেছিল। পথে পোড়া নিকিরীপাড়ার বিরাট চিতাটা তখনও ধোঁয়াচ্ছে। রাস্তার পাশ থেকে গলিত শবের গন্ধ আসছে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের রাস্তাঘাট তৈরি করা খোলা বিস্তীর্ণ জায়গাটার ধারেই নিকিরীপাড়া। নতুন রাস্তার উপর কয়েকখানা নৌকো পড়ে রয়েছে। নৌকোর উপর বসে রয়েছে কতকগুলো শকুন, ঘুরছে কয়েকটা কুকুর, গোটা রাস্তাটা বস্তির ছাইয়ের গুঁড়োতে কালো হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে পড়ে রয়েছে পচে ফুলে ওঠা কয়েকটা শব। মসজিদ একটা কালো হয়ে গেছে পুড়ে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল আরতি!

"আপনি আশেপাশে তাকাবেন না। বরং নাকে কাপড় দিয়ে চোখ বুজে থাকুন। এখানে অনেক লাশ পড়ে আছে।"

বললেন মাধববাবু। তারপরই আবার বললেন, "আরও পাবেন শোভাবাজারে। হাবু গুণ্ডার আড্ডার ওখানে।"

মাধববাবুর সঙ্গী মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ রে সেই লাসটা সরিয়েছে? কবন্ধটা?"

"দা দিয়ে দু-ফাঁক করাটা? সরিয়ে থাকবে। তবে সকালেও ছিল। রতন বলছিল।"

"ওখানেও ত সাদা ক্যাডিলাক এসেছিল?"

"কী করবে এসে। হিন্দুর ঘরে আগুন জ্বালালে, সে আগুন মুসলমানের ঘরেও লাগে। হিন্দুর ঘরের কাছে এসে সে-আগুন নিভে যায় না।"

"এ-পথে নিয়ে এলেন কেন?" অধীর আর্তস্বরে কথা কটা বেরিয়ে এল আরতির কণ্ঠ থেকে!

"কী করব বলুন। সব পথের ধারেই এ কিছু না কিছু ঘটেছে। অবশ্য এ-দিকটায় কিছু বেশী। কিন্তু আসতে হল বাধ্য হয়ে। যে গাড়ি ড্রাইভ করে যাবে, তাকে শোভাবাজার থেকে নিতে হবে।"

"আপনি যাবেন না?"

"আমার যাওয়ার উপায় নেই। শোভাবাজারে কিছু মুসলমান আছে—তাদের রেস্কু করতে আসবে পুলিশ! আমি সেখানে থাকব। আপনার ভয় নেই, যে ড্রাইভার যাবে, সে আমার থেকে খারাপ চালায় না। সাহস হয়তো আমার থেকেও বেশী। আর সঙ্গে এই শম্ভু রইল। কোন ভয় নেই আপনার।"

হঠাৎ আরতি বলে উঠল, "আমার মামাদের কেউ যদি বাড়িতে না থাকেন?"

হেসে মাধববাবু বললেন, "এই গাড়িতে ফিরে আসবেন। অন্য কেউ কাছাকাছি পরিচিত থাকলে—সেখানেও এরা পৌঁছে দেবে। আপনাকে নিশ্চয়ই সেখানে নামিয়ে দিয়ে আসবে না।"

আরতির মনে তখন মামাতো-ভাইরা কী অভ্যর্থনায় তাকে অভ্যর্থিত করবে—সেই কল্পনা উঁকি মারতে শুরু করেছে। মতভেদের ক্ষেত্রে যেখানে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়, সেখানে বিপন্ন হয়ে গেলেও

আক্রমণের সুযোগ সামলাতে পারে না, এমনি মানুষই সংসারে বেশী। তা ছাড়া তার মামাতো-ভাইদের মুখ মনে পড়ছে। মদ্যপ-চরিত্রহীন একদল শুধু পাশ করা বি.এ-এম. এ ডিগ্রীর জোরে এবং অর্থের জোরে সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে ঠেলে গিয়ে বসে, শুধু অর্থের জোরেই তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং তীব্র। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি দেশের আবেগময় সহানুভূতি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষ্য ক'রে আজ তারা অতি চতুরতার সঙ্গে নিজেদের নেতাজীর দলভুক্ত বলে ঘোষণা ক'রে—ভাবী কালের সামাজিক আসনের দাবী তৈরী ক'রে রাখছে।

এটা আজ ব্ল্যাকমার্কেটীয়ারের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের মত আত্মসাৎ করা মূলধন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ এই যুদ্ধের কয়েক বৎসরে তারা গোপনে কত টাকা ব্যয় করেছে আজাদ হিন্দ ফৌজের আগমন-পথ প্রশস্ত করবার জন্য, কতবার কোন মোটর-যাত্রায়, কত ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীদের কোথায় কোন্ অরণ্যে তুলে কোথায় পার করে দিয়েছেন, কোন নগরের কোন গুপ্তাবাস থেকে সতর্ক পুলিশ-দৃষ্টি থেকে সরিয়ে এনেছেন, কোথায় কোন বোমার বা পিস্তলগুলির থলি পৌঁছে দিয়েছেন, কোন যাত্রায় ষাট মাইল থেকে আশি একশ-তে স্পীড তুলে কোন অনুসরণরত পুলিশ-মোটরকে ফাঁকি দিয়েছেন, কটা পিস্তল রিভলবার এমন কি রাইফেলের গুলি সাঁই সাঁই করে কানের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করে তারা আজ মহাদর্পিত ব্যক্তি। নিষ্ঠুরভাবে রূঢ়ভাষী!

গাড়িটা থেমে গেল। শোভাবাজারের একটা গলির মোড়!

আরতি চিন্তার ক্লান্তিতে সিটের মাথায় মাথা রেখে ভাবছিল। চোখ বুজে ভাবছিল। সে মাথা তুললে না—চোখও খুললে না। বুঝতে পারলে মাধববাবু নেমে গেলেন। তাঁর জায়গায় নতুন লোক উঠল।

মাধববাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, "চোখে কী হল? গগল্‌স্ কেন?"

"লাল হয়েছে একটা চোখ, জল পড়ছে। ওবেলা পোড়া-বস্তিটায় ঘুরে দেখলাম, বোধ হয় ছাইটাই পড়েছে।"

"রাত্রে একটু কম্প্রেস ক'রো। চলে যাও। তোমাকে বলার কিছু নেই। খুব হুঁশিয়ার!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।

"স্ট্র্যাণ্ড হয়ে ময়দানে পড়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরবে।"

গাড়িটা গর্জন করে উঠল। নড়ে উঠল। কণ্ঠস্বরে মনে হল এ কালকের সেই বিচিত্র ভারী কণ্ঠস্বর। বারেকের জন্য একবার চোখ মেলে দেখে আরতি আবার চোখ বুজল।

হ্যাঁ—এ সেই। কে? কিন্তু সে চিন্তা-প্রশ্ন তার এই মুহূর্তে মুছে গিয়ে বড় মামাতো-ভাইয়ের মুখ মনে পড়ে গেল। এবং দেখা হতেই কী কথা বলে সে তাকে সম্ভাষণ করবে, তাও তার কল্পনায় কানের পাশে বেজে উঠল; গাড়িটা ছুটছে হু-হু করে। লোকটি স্থিরভাবে বসে আছে। স্টিয়ারিং কাঁপছে গতিবেগে কিন্তু লোকটির হাতের মুঠো যেন লোহার।

মামার বাড়ির দরজায় কিন্তু বড় মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল না। সেখানে দাঁড়িয়েছিল—ছোট মামাতো ভাই। বড় ভাইয়ের ও-পিঠ। সে তাকে দেখবামাত্র বলে উঠল, "মাই গড। কমরেড আরতি সেন! যাক বেঁচে আছ? বেশ-বেশ। তা এস।"

কথা বলার ভঙ্গিতে আরতির মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। এই মুহূর্তে এইভাবে কথা বলতে পারে? পারে বই কি। তার মামাতো ভাই সে কথা প্রমাণ করে দিয়ে বক্র হেসে আবার বললে, "কী ব্যাপার? ইনকিলাব জিন্দাবাদের ফার্স্ট শকেই ভেঙে পড়লে? তুমি ত পাকিস্তানের সাপোর্টার গো। কমরেডদের ত ঝাণ্ডা দেখালে পারতে। সুড়সুড় করে ফিরে যেত।"

আরতি আত্মসম্বরণ করতে পারলে না—সে বলে উঠল, "না, কোন ঝাণ্ডাই আমার ঝাণ্ডা নয়! কোন দলের সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক নেই। যাদের বোমায় আমার ভাই মরেছে, যাদের বমিংয়ের শকে আমার বাবা মরেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমি চিরদিন থাকব। আমি পাকিস্তানের সাপোর্টার কোনদিন নই। তোমাদের মত একাধারে বিলাসী পলিটিসিয়ান এবং ধর্মধ্বজীও নই। যারা আমার চোখের সামনে ঘরদোর লুঠ করলে, অত্যাচার করলে জানোয়ারের মত, তারা আমার শত্রু। আবার দেখে এলাম, নিরীহ মুসলমান বস্তি পুড়ছে, তাদের শবদেহ পচছে। এসব যারা করেছে, তারাও আমার বন্ধু নয়। তাদেরও আমি কেউ নই। তবে যারা অত্যাচারীর সঙ্গে সামনাসামনি লড়েছে, তাঁদের শ্রদ্ধা করি।" মুহূর্তের জন্য কথায় ছেদ টেনে আবার সে বললে, "জান, কপাল

আমি মানি না। তবে কপাল ছাড়া কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলছি, কপালের ফেরেই আজ তোমরা মামাতো-ভাই বলে কয়েক দিনের জন্য তোমাদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছি।"

"আশ্রয় অবশ্যই পাবে। তেমন হৃদয়হীন আমরা নই। ওগুলো অনেক দুঃখেই বলেছি। কথাগুলো মনে পড়ে যায় যে। জঘন্য স্পাই-বৃত্তি করতেও বাধে নি তখন। আমাদের পিছনে পুলিশ লেগেছিল। সে-সব খবর তুমি ছাড়া কে দিয়েছিল? সে বিষয় আমার কোন সন্দেহ নেই!"—

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চিৎকারে থমকে গিয়েছিল সকলে। আরতির মামাতো-ভাইও চুপ করে গেল। ঠিক এই সময়ে ওই ড্রাইভারটি তার ভরাট গলায় কল্পনাতীত একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল, "অ্যাও!"

একটা কুকুরকে। এই বাড়িরই পোষা একটা ছুঁকছুঁকে স্প্যানিয়েল জাতীয় কুকুর কখন বেরিয়ে এসেছিল ফটক খোলা পেয়ে। তখনও কথা হচ্ছিল ফটকের মুখে দাঁড়িয়ে। কুকুরটা মনিবকে পার হয়ে কাটা লেজটা বুড়ো আঙুলের মত নেড়ে একে-ওকে শুঁকে এবং চেটে বেড়াচ্ছিল। মালিক এবং আরতিকে অতিক্রম করে এসে ওই ড্রাইভারটিকে দেখে ঘেউঘেউ করে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাকে এমনি জোরে ধমক দিয়েছে ড্রাইভারটি।

কুকুরটা ভয় পেয়ে ছুটে পালাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মালিক অর্থাৎ আরতির মামাতো-ভাই চিৎকার করে উঠল, "ইউ ব্রুট! কেন তুমি কুকুরটাকে এমন করে ধমক দিলে? কেঁও? Why?"

আশ্চর্য ঘৃণায় ড্রাইভারটির ঠোঁট উল্টে গেল—সে ঘৃণার সঙ্গে বললে, "আই হেট ডগ্স। আই হেট ডগ্স। বিশেষ করে যেগুলো অকারণে মানুষ দেখে চিৎকার করে।" সে কথার সুরের মধ্যে কি অবজ্ঞা এবং কি ঘৃণা। যেন ওল্টানো ঠোঁট থেকে অন্তরের মর্মান্তিক ঘৃণা উপচে ঝরে পড়ল এবং তার স্পর্শ লাগল সকলকে।

"হোয়াট?" রাগে খেপে উঠল আরতির মামাতো-ভাই। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানা উদ্যত হয়ে উঠল ড্রাইভারের মাথার চুল ধরবার জন্য।

ড্রাইভারটি তার হাত উঠিয়ে বাড়ানো হাতখানা ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বললে, "কিছু মনে করবেন না, আমার চুল ধরলে আপনার হাত ধরতে হবে আমাকে। আমার হাত অত্যন্ত শক্ত। পনেরো ষোল বছর বয়সে শেয়াল কামড়েছিল আমাকে, আমি শেয়ালটার চোয়াল চেপে ধরেছিলাম। চোয়ালটা ভেঙে গিয়েছিল। নখ দিয়ে আঁচড়েছিল অনেক, দেখুন দাগগুলো এখনও আছে। রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না।"

বলেই সে গাড়িতে চেপে বললে, "শম্ভুবাবু আসুন, আমাকে আর হাঙ্গামায় ফেলবেন না। ওদিকে বেলা যাচ্ছে। সন্ধ্যের পর কারফ্যু।"

শম্ভু আরতিকে বললে, "তা হলে আমরা যাই মিস সেন!"

আরতি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; সে যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অন্তরের স্মৃতিলোকে আলোড়ন উঠেছে; যেন ঝড় বইছে।

আরতির মামাতো-ভাই তখন চিৎকার করছে—"স্টপ স্টপ, আই সে, স্টপ !"

গাড়িখানা স্টার্ট নিয়ে নড়ে উঠেছিল, থেমে গেল।

শম্ভু বললে, "না-না, চল রতন ! চল !"

নামতে যাচ্ছিল রতন ড্রাইভার, কিন্তু শম্ভুর কথায় নামতে ক্ষান্ত হয়ে শুধু একবার আরতির মামাতো-ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়িটা বেরিয়ে গেল অস্বাভাবিক প্রচণ্ড গতিতে।

আবারও চিৎকার করে উঠল আরতির মামাতো-ভাই, "স্টপ, ইউ সোয়াইন ! ই-উ রাসক্যাল !"

"কী হয়েছে ? কী ?"

বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। "লাটু, এত চিৎকার করছ কেন ? এ কী, আরতি ? তুই বেঁচে আছিস ? ভাল আছিস ? আয়, আয়, ভেতরে আয়। বউমা—বউমা— !"

আরতি তবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এও কি সত্যি হতে পারে ? তাই কি হয় ? একটা প্রবল প্রশ্ন তার মনের মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের একটা দিগন্ত থেকে দিগন্ত-বিস্তৃত বিদ্যুত রেখার মত বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। সে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েই রইল।—

দুজন মানুষের 'আই হেট' বলার সঙ্গে এমনি ঠোঁট ওল্টানোর ভঙ্গি হয়তো একরকম হতে পারে। হয়। একরকম ছাঁচের মানুষ

হয়। নৃতত্ত্বে এর নজির আছে। একরকম মুখ হলে হাসি একরকম হয়, কথা বলার ভঙ্গি একরকম হয়। হয়! হাতের জোরও অনেকের আছে! শুধু হাতে বাঘ মেরেছে এমন মানুষের কথাও শোনা যায়। পাগলা শেয়ালের চোয়াল ভাঙাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু ছুজনের হাতে কি ঠিক একরকম ক্ষতচিহ্ন হয়? ঠিক একরকম!

কিন্তু তা-ই বা কী করে হয়? সচ্ছল অবস্থার সরকারী চাকুরের ছেলে—নিখুঁত ফ্যাশনদোরস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসের ছাত্র; চোখেমুখে অফুরন্ত দীপ্তি, বিলাসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ, ভবিষ্যতে যে বিলেত যাবে; বড় ডিগ্রী নিয়ে এসে এখানে বড় সরকারী চাকরি নেবে; মোটর চড়ে ঘুরবে; সুসজ্জিত আপিসে বসবে; প্ল্যান তৈরী করবে, নোট লিখবে; সমস্ত মানুষকে অবজ্ঞা করে কথা বলবে; রাত্রে নাইট ক্লাবে যাবে—হৈ-চৈ করবে! এই ভেবে নিজেকে যে তৈরী করছিল, সে কিসের পরিণতিতে ওই ড্রাইভার হতে পারে? কিন্তু—কিন্তু—সেই কণ্ঠস্বর! সেই হাতের ক্ষতচিহ্ন! সেই 'আই হেট' বলার ভঙ্গি, সেই ক্রোধ!···দাড়িগোঁফে মুখখানা ঢেকে গিয়েছে। মাথায় বড় বড় চুল। অযত্নে, মোবিলে, পেট্রোলে তামাটে হয়ে উঠেছে। তার ছিল সযত্ন ফ্যাশনে ছাঁটা, শ্যাম্পু করা রেশমের মত চুল। তার ছিল উগ্র গৌরবর্ণ। সে-রঙ কি এমনি পুড়ে যায়, না যেতে পারে? চোখের তারা তারও পিঙ্গলাভ ছিল—এরও পিঙ্গলাভ। কিন্তু তবু কি এ সে হতে পারে?

প্রবীর! প্রবীর চ্যাটার্জি!

ওই রতন ড্রাইভারের মধ্যে প্রবীর চ্যাটার্জি!

কিন্তু সেদিন হারিয়ে যাওয়া আংটিটা আর আবর্জনা স্তূপের আংটিটা তার শত মালিন্য সত্ত্বেও এক হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এক। একটু মার্জনা করলেই তার সোনার ও হীরার দীপ্তি যেন আপন ঔজ্জ্বল্যে স্বপ্রকাশ হয়ে উঠবে।

মনে পড়েছে প্রবীরের ঠোঁট ঘৃণায় এইভাবে উল্টে গিয়েছিল। চোখের উপর ভাসছে তার সে ছবি। ওই ইউনিভার্সিটিতেই। ১৯৪২ সাল।

॥ চার ॥

মনে পড়ছে।—

ঠিক ওই ছাত্র দুইটিকে দিয়ে ঘটনার কয়েকদিন পর। তার আরতি নামের সুবিধে নিয়ে 'রতি' বলে গূঢ় অর্থব্যঞ্জক রসিকতা করার যে-ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর ঘোষ—সেই ঘটনাটার দিন দশেক পর। সেদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতেই তার চোখে পড়েছিল লনের উপর আড্ডারত কয়েকটি ছেলের একটি দল যেন হঠাৎ একটা বাতাসের দমকায় ছাই-ওড়া অঙ্গারস্তূপের মত দীপ্যমান হয়ে উঠল, চোখে মুখে একটা ইশারা খেলে গেল। একবার মনে হল বাতাসের দমকাটা সঞ্চারিত হল তার আঁচলের দোলাথেকেই। কিন্তু সে তা গ্রাহ্য করে নি, ঢুকে গিয়েছিল মেন বিল্ডিংয়ে। ও আগুনকে সে ভয় করে না, পায়ের জুতোর তলায় চেপে নিভিয়ে দেবে। সমস্ত বাড়িটা যেন নিস্তব্ধ; সে খট খট করে উপরে উঠতে লাগল। আজ সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা; ছাত্রছাত্রীদের দল যেন অধিকাংশই আসে নি। পরক্ষণেই মনে পড়েছিল,—সিঙ্গাপুর পুড়ে গিয়েছে, জাপানীরা এগুচ্ছে রেঙ্গুনের দিকে; যুদ্ধের অবস্থা দিন-দিন বৈশাখের আগুন-লাগা উলুবনের মত হয়ে উঠেছে; ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে আগুন জ্বলবে-জ্বলবে হয়ে উঠেছে। এখন ছাত্র-মহলে মিটিংয়ের পর মিটিং চলছে। নানা মতের প্রবল প্রচার চলছে। এরই মধ্যে চলেছে পূর্বরাগের পালা, বিয়েও কয়েকটা হয়ে গেছে।

তা যাক। ওরা এই ছেলেগুলির মত নয়—যারা ছাই-ওড়া অঙ্গারের মত কালো স্বরূপ প্রকট করে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। এরা রাজনীতিবাদী কোন দলের নয় বলেই এই ভাবে বাইরে বাইরে পচা পাতার মত উড়ে উড়ে বেড়ায়; ওদের সম্বল ওড়া-পাতার ফরফরানির মত ওই হাসি-রসিকতা। রাখালরাজাদের বাঁশি ছাড়া গতি নেই। হায় কপাল! বাঁশি শুনে ব্রজের গোপিনীরা ভুলেছিল বলে কি বিংশ-শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের তরুণীর দল ভুলবে? বাঁশি, তাও সেই আদ্যিকালের বাঁশের বাঁশি! কিন্তু ওই বাঁশি বাজাতেই জানে—তাছাড়া আর কিছু নয়; গোবর্ধন ধারণ দূরের কথা যে গোপিনীর হাতে থাকে বঁটি কি খন্তা তাদের দেখলে ছুটে পালায়। রাজনীতি যারা করে আরতি তাদের দলের নয়, কোনদিন সে যাবেও না, কিন্তু তবু তাদের সে প্রশংসা করে। হ্যাঁ একটা আদর্শ আছে তাদের, তাদের দলের মধ্যে তরুণ-তরুণীর মনের মিলন ঘটে হাত মিলিয়ে কাজ করার মধ্যে।

সে প্রথম তলায় উঠেছে এমন সময় কেউ তাকে ডাকলে—

"শুনুন!" একটি মেয়ে; তারই সহপাঠিনী। চেনে সে। নাম বোধ হয় অনীতা।

"আমায় বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বলুন। কিন্তু আজ ব্যাপার কী বলুন ত?"

"ফাঁকা দেখে বলছেন?"

"হ্যাঁ। মিটিং বোধ হয় ?"

"হ্যাঁ। বড় মিটিং আজকে। ইউনিভার্সিটির বাইরে কোথাও হচ্ছে। ক্লাসটাস বোধ হয় হবে না। আমি আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।"

"আমার জন্যে ?"

"হ্যাঁ। চলুন, বাড়ি ফেরবার পথে বলতে বলতে যাই।"

"না। আমি ভাই একটু লাইব্রেরিতে যাব।"

"না। আপনি থাকবেন না। চলুন। আপনাকে অপমান করবার জন্যে বোধ হয় একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে। সেদিন আপনি একজন ছেলের খাতা কেড়ে নিয়ে—"

"হ্যাঁ। আবার কেউ অসভ্যতা করলে আবারও নেব! এবং এবার গালে চড় মারব।" নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল,—"আপসোস হচ্ছে, শু পরে এসেছি, স্যাণ্ডেল পরে আসি নি। শু আবার নতুন—চট করে খোলা যায় না।"

মেয়েটি সভয়ে বলেছিল—

"না না আপনি জানেন না। সে মারাত্মক বেপরোয়া ছেলে। রাস্টিকেট হওয়াকেও ভয় করে না। শুনেছি বি. এস.সি যখন পড়ত তখন গার্ল স্টুডেন্টদের জ্বালিয়ে খেত। মেয়েদের অ্যাড্রেস করে "পাগলী" বলে। একচড় মারলে দু'চড় মারবে সে। একবার এক্সপেল্‌ড্‌ হয়েছিল—। আজ অন্য ছেলেমেয়ে মিটিংয়ে ব্যস্ত আছে জেনে—ওরা দল বেঁধেছে।"

সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল তার। বলেছিল, "কোথায় আছে বলুন না। আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে বলি, হ্যালো পাগলা,—"

সঙ্গে সঙ্গেই মোটা গলায় নিচের তলার দিক থেকে কেউ হেঁকে বলেছিল—

"ইয়েস, ইয়েস, হিয়ার আই অ্যাম, পাগলী, হিয়ার আই অ্যাম।"

চমকে উঠছিল দুজনেই। নিচের সিঁড়ির মুখে কখন এরই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে একটি স্যুট-পরা ছেলে। ব্যাকব্রাশ-করা চুল, বড় বড় চোখ, বয়স বেশ একটু বেশী। দেখেই চেনা যায়, যে-ছেলেরা পাঠ্য-জীবনের ভেলা ধরে যৌবন সমুদ্রের স্নানের ঘাটে দোল খায় সুইমিং কস্ট্যুমের মত স্টুডেন্টস্ কস্ট্যুম পরে, এ তাদেরই একজন।

এতক্ষণ বোধ করি কোথাও লুকিয়েছিল নিচের তলায়; ওই ছেলেগুলোর কালো মুখের ইশারা পেয়ে সিঁড়ির মুখে নায়কের মত প্রবেশ করেছে। ছেলেটা প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি উঠে, একমুখ ব্যঙ্গ হাসি নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, "আমি এসেছি পাগলী! হিয়ার আই অ্যাম!"

কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরতি। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল—"কী চান আপনি?"

"আই ওয়াণ্ট টু অ্যাডোর য়্যু। তোমার এই বেশভূষা, তোমার এই শ্যাম্পু-করা চুলের মধুর গন্ধ, পাউডারের হাল্কা সুরভি, আই অ্যাডোর পাগলী, আই অ্যাডোর। তোমার থুতনিতে হাত দিয়ে বলতে চাই আই অ্যাডোর য়্যু।"

"আমি চিৎকার করব।"

"আই ডোণ্ট কেয়ার পাগলী। ওই উপরে দেখ আমার দল

আছে ; নিচে দেখে এসেছ গেটের সামনে—তোমার চিৎকারে কেউ আসতে আসতে তোমাকে প্রেম নিবেদন করে চলে যাব।”

“কাওয়ার্ড!”

“তা যদি বল তবে অবশ্যই থাকব। যিনিই আসুন, তাঁর সামনেই বলব, আই অ্যাডোর হার। রাস্টিকেট হওয়াকে আমি ভয় করি না। আমি এখানকার রেগুলার ছাত্রও নই।”

ঠিক এই সময় উপরতলার সিঁড়িতে জুতোর শব্দ উঠেছিল।

সকলেই তাকিয়েছিল উপরের দিকে। উপরতলার ছেলেরা সাড়া দিয়ে ইঙ্গিতে কিছু জানিয়েছিল। সে-ইঙ্গিতে এই অভদ্র দুঃসাহসী ছেলেটি একটু ভ্রু কুঁচকেছিল শুধু। ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিল, “কি ? কে ?”

রেলিংয়ে ঝুঁকে যারা ইশারা জানাচ্ছিল তারা কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু এ ছেলেটি গ্রাহ্যই করে নি। ঠিক তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভারী জুতোর শব্দ তুলে একজনকে নামতে দেখা গিয়েছিল। নেমে আসছিল ‘ইউ টি সি’র পোশাক পরা একটি ছেলে। কটা চোখ, রঙটা খুব ফরসা, দীর্ঘকায় তরুণ। আরতি চেনে না। ইউনিভারসিটিতে দেখে নি। তবুও সে চীৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল, “শুনুন।” কিন্তু তার আগেই এই দুঃসাহসী ছেলেটি হেসে তাকে সম্ভাষণ করলে, “হ্যালো প্রবীর!”

সে পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিল—হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে বললে, “সুব্রত। তুমি ?”

“ইয়েস ওল্ড চ্যাপ, ভাল আছ ?”

"তা তো আছ। কিন্তু তুমি এখানে কি করছ? আবার পড়বে নাকি? ভর্তি হয়েছ? ওঃ দেখালে বটে!"

"পড়ছি না ঠিক। কলেজের আশেপাশে ঘুরছি। কিন্তু তুমি কোথায়? এ-রাজ্যে—শিবপুর থেকে—"

"স্যার-এর তলব ছিল 'ইউ টি সি'র কাজে। আচ্ছা গুড লাক।" বলে হেসে চলে যাবার উদ্যোগ করেও আরতির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। পরক্ষণেই সবিস্ময়ে বললে, "আপনি রথীনবাবুর বোন না? রথীন সেন? শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে পাশ করে বিলেত গেছেন? আমরা রথীনবাবুর জুনিয়র। সে-সময় আপনি তো মধ্যে মধ্যে যেতেন হোস্টেলে! কেমন আছেন রথীন দা?"

"প্রবীর, তুমি যাও! ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

প্রবীর এবার দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিল, "আই স্মেল সামথিং সুব্রত।"

মুহূর্তে আরতি বলেছিল, "ইনি আমাকে অপমান করছেন। আপনি—আপনি—" আর কথা বলতে পারে নি—চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল।

"লীভ হার, প্রবীর। ওঁর সঙ্গে ব্যাপারটা বলতে গেলে এখানকার ছেলেদের ব্যাপার।"

"এখানকার ছেলেদের ব্যাপার হলে—তারা কই? তুমি কেন? ছি ছি সুব্রত, এখনও তোমার এই নোংরামিগুলো গেল না।"

"শাট আপ।" চিৎকার করে উঠেছিল সুব্রত।

"চিৎকার করো না। আই ডোণ্ট লাইক ইট। আমার চিৎকার

তোমার থেকে অনেক জোরে বের হয় তুমি জান। পথ ছাড়। চলুন আপনারা আমার সঙ্গে।”

“না। আবার বলছি প্রবীর, চলে যাও তুমি। আমরা পুরনো বন্ধু—”

“না। উই ওয়ের নেভার ফ্রেণ্ডস। আই হেট ইউ অলওয়েজ। ডার্টি ভালগার কোথাকার।”

ঘৃণায় ঠোঁট দুটো ঠিক এমনিভাবে উল্টে গিয়েছিল।

“হোয়াট ?” সঙ্গে সঙ্গে সে মেরেছিল একটা ঘুষি। অতর্কিতে মারবার জন্যই মেরেছিল। কিন্তু প্রবীর যেন প্রস্তুত ছিল। খপ করে হাতখানা ধরেই একটু মোচড় দিয়ে কায়দা করে ফেলেছিল তাকে এবং হেসে বলেছিল, “আমি তোমার পুরনো ট্রিকস্ জানি সুব্রত। আমি তৈরী ছিলাম।”

“ছাড়। হাত ছাড়!”

“জোর কর না। আমার হাতের জোর বেশ একটু বেশী। ছেলেবেলা পনের-ষোল বছর বয়সে একটা পাগলা শেয়ালের কামড়েছিল আমাকে। পায়ে কামড়াচ্ছিল, আমি হাত দিয়ে তার চোয়ালটা ধরে ভেঙে দিয়েছিলাম। নখ দিয়ে হাতটা আঁচড়ে দিয়েছিল, দাগ দেখতে পাচ্ছ তার ? দেখেছ ?”

“প্রবীর!” এবার সুব্রতের চিৎকারের মধ্যে যন্ত্রণার আভাস ছিল।

“আরও একটু যন্ত্রণা দেব সুব্রত! যাতে তোমার সামলাতে কিছুক্ষণ লাগে।” হাতটায় আরও খানিকটা মোচড় দিতেই একটা আর্তনাদ করে সুব্রত বসে পড়েছিল। এবার তার হাত ছেড়ে দিয়ে,

সে আরতি এবং তার সঙ্গিনীকে বলেছিল, "আসুন, আর দাঁড়াবেন না। শুনছেন ?"

আরতি এবং তার সঙ্গিনী নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রবীরের কথা শুনে দ্রুত পদে নামতে আরম্ভ করেছিল, সে প্রায় যেন ছুটে পালাচ্ছিল তারা।

"ছুটবেন না। ছুটতে হবে না।"

"ওপর থেকে ওর সঙ্গীরা নামছে।"

"নামুক! যারা নোংরামি করে, তার নিরেনব্বুই জন কাওয়ার্ড! একজন সুব্রতের মত ডেভিল থাকে। ওদের সাহস থাকলে ওরা বাইরে থেকে সুব্রতকে ডাকত না। আপনার সঙ্গে কি হয়েছে জানি না। যা-ই হয়ে থাক, নিজেরাই বোঝাপড়া করত। এবং যেদিন এখানকার সব ছেলেই প্রায় দেশের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে অনুপস্থিত, সেই দিনটিতেই করত না।"

বলতে বলতেই তারা বেরিয়ে এসে কলেজ স্ট্রীটের গেটের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। গেটের দলটি তখন ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছিল। শুধু একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলেছিল, "এর বোঝাপড়া বাকী রইল, প্রবীরবাবু। কিন্তু হবে একদিন!"

ক্ষতচিহ্নে চিত্রিত হাতখানা প্রসারিত করে প্রবীর বলেছিল, "ফলো ইওর ফ্রেণ্ডস। ওই যাচ্ছে। এগিয়ে এসো না।"

"আচ্ছা—"

বাধা দিয়ে প্রবীর বলেছিল; "আই হেট টু স্পীক টু ইউ।" ঘৃণায় প্রবীরের ঠোঁট দুটো উল্টে গিয়েছিল।

সেই প্রবীর, আর এই মোটর-ড্রাইভার অথবা মিস্ত্রী রতন। কী করে মেলে? কিন্তু আশ্চর্য মিল! আশ্চর্য! সেই কণ্ঠস্বর! সেই 'আই হেট' বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটি ঠিক তেমনি করে উল্টে যাওয়া। হাতে সেই ক্ষতচিহ্ন। আশ্চর্য মিল! সেই ক্ষতচিহ্নটা সে নিজে ভাল করে দেখেছিল যে! খুব ভাল করে। সেদিন ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে প্রবীর তাকে একা ছেড়ে দেয় নি। ট্রামেই হোক, আর বাসেই হোক, সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। বলেছিল; "এমন কি ট্যাক্সিতেও আপনার আজ একলা যাওয়া উচিত নয়। সুব্রত আসলে কুব্রত। সব সমাজেরই কতকগুলো কলঙ্কের মত জীব থাকে। ও ছাত্রসমাজের কলঙ্ক। ওকে জানেন না। ট্যাক্সিতেও ও আপনার পিছন নিতে পারে।"

আরতির সঙ্গিনীকেও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছিল। আরতির বাড়ি কপালিটোলা শুনে বলেছিল, "তবে তো এই কাছেই। চলুন, হাঁটতে হাঁটতেই চলি।"

আরতির সঙ্গিনী ছিল শ্যামবাজারবাসিনী। মির্জাপুর স্ট্রীট এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর মোড়ে সে বিদায় নিয়ে বাসে চড়েছিল। বলেছিল, "এক বাস লোক রয়েছে—আর ওদের কাউকেও দেখছি না। আমি সেফ্‌লি চলে যাব। আপনি আরতিকে পৌঁছে দিন।"

পথে মাত্র দুটি কথা হয়েছিল। প্রবীর বলেছিল, "আপনাদের তো গাড়ি আছে!"

"না। বিক্রি করে দিয়েছেন বাবা।"

“ও। গভর্নমেণ্ট যুদ্ধের জন্য গাড়ি নিয়ে নিচ্ছে এখন। হ্যাঁ, তার চেয়ে বিক্রি ভাল।”

“না। আমাদের ব্যবসায় অনেক লোকসান হয়েছে। আমাদের প্রায় সব গেছে।”

এর পর আর কথা হয় নি।

বাড়িতে চা খেতে অনুরোধ করেছিল একটু। সেই চা খাবার সময় কৌতূহল-ভরে তার আস্তিন-গুটোনো হাতখানার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “ছেলে-বয়সে খ্যাপা-শেয়ালের চোয়াল চেপে ধরতে ভয় করে নি আপনার?”

“বরাবরই ভয় আমার একটু কম। আমরা তখন জলপাইগুড়িতে থাকি। সেই সময় আমাদের একজন গুর্খা ড্রাইভার ছিল। সেই আমার সাহসের গুরু। যাকে বলে—ডেয়ার-ডেভিল! ছোট হাতদেড়েক লাঠি নিয়ে বড় বড় সাপ মারত। কুক্‌রি দিয়ে একটা নেকড়ে দুটো ভালুক মেরেছিল। আর গল্প বলত। তাকে জিজ্ঞাসা করতাম—‘ভয় করে না?’ সে শুধু হাসত। সে যেন পরম কৌতুক। হাসির আতিশয্যে বেচারার চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে যেত। হেসে-টেসে নিয়ে বলত একটি কথা—‘বয়? না! বয় কাহে ওগা? উ জানবর, হম আদমী। মর্দানা! উসকে তাগদ হ্যায়, দাঁত হ্যায়, নখ হ্যায়, পঞ্জা হ্যায়। হমর ভি সব আছে! কুকরি আছে। লাঠি আছে!’ গল্প বলত, ছেলেবেলায় একবার বনের মধ্যে একটা বড় গর্ত দেখে কৌতূহলবশে হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে ঢুকেছিল। খানিকটা ঢুকেই দেখে একজোড়া চোখ জ্বলজ্বল

করছে। অবস্থা বুঝুন! সামনাসামনি! তার বেরুবার পথ—সামনের দিকে অর্থাৎ এর দিকে। এনার মুখ তাঁর দিকে। এর পিছন ফেরবারও উপায় নেই, কারণ গর্তের মুখটা তত পরিসর নয়। পিছন ফিরলে আরও বিপদ; সে কামড়াতে আসছে কিনা দেখতে পাওয়া যাবে না। তখন কী করে? সেই চোখ-বুজে-যাওয়া হাসি হেসে বলত, 'কী করেগা? উসকো সামনে খুব খ্যা-খ্যা-খ্যা—চিল্লায় দিয়া; বহত জোর সে! ব্যস, উ বুড়বক বন গেয়া। উসকে বাদ থোড়া থোড়া পিছে হটনে লাগা। এক একবার থম্ কর—ফিন—খ্যা-খ্যা আওয়াজ দিয়া। ফিন থোড়া হট লিয়া। ব্যস, একদম বাহারমে আ কর গাঢ়াকে মুসে—একতরফ যা কর খাড়া হো গিয়া।' মানে দরজা থেকে বেরিয়ে চট করে একপাশে সরে দাঁড়াল আর কি। 'আওড় গাঢ়াসে এক ছোটাসা ভাল্লু নিকালকে একদম ঘোড়াকে মাফিক দৌড়কে বনমে ঘুস গিয়া! যো ডর দেখায়েগা, উসকে অপ ডর দেখাইয়ে না। বগ্ যায় গা।' তা ছাড়া বাবার আমার শিকারে শখ ছিল। কাজেই—"

হেসেছিল একটু প্রবীর।

ততক্ষণ আরতি তার সবল হাতখানার দিকেই তাকিয়ে ছিল। এবার হাতখানা ধরে কাছে নিয়ে দেখে বলেছিল, "ওঃ—আপনাকেও জখম করেছিল খুব।"

"হ্যাঁ। আমাকে একবার কামড়ে পালিয়ে গেলে পারতাম না কিছু করতে। কিন্তু বারবার কামড়াতে লাগল। আমারও খুন চেপে গেল। ডান হাঁটুটায় কামড়াচ্ছিল—সেই হাঁটু দিয়েই সেটাকে

মাটিতে ফেলে চেপে ধরে দুই হাতে মুখের দুটো ভাগ চেপে ধরে জরাসন্ধ বধের মত টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম। যন্ত্রণায় সামনের পা দুটো দিয়ে সেও হাতের উপর থাবা চালাতে চেষ্টা করলে। একটা পা আমার বাঁ পায়ে চাপা পড়েছিল, একটা পায়ের থাবা অন্তিম যন্ত্রণাতে সে আমার এই হাতটার উপর চালিয়েছিল।" হাঁটুতেও একটা ক্ষত চিহ্ন আছে! তবে ট্রপিক্যালে ইনজেকশনের যন্ত্রণার শোধ নেওয়াটা হয় নি।"

প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার মুখ।

ঠিক এই সময়টিতেই তার বাবা বাড়ি ফিরেছিলেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত, ভেঙে-পড়া মানুষ। কয়েকটা মাসের মধ্যে মানুষটি কী যে হয়ে গিয়েছিলেন! আগেকার কালের সেই দৃঢ়তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। যে-মানুষের দৃপ্ত কথায়-বার্তায় মতবিরোধীরা স্তব্ধ হয়ে যেত, সেই মানুষের বুলি হয়েছিল, 'জানি না—ঠিক বুঝতে পারছি না।' যাঁর প্রাণখোলা হাসিতে আশপাশের বাড়ির লোকেরা চমকে উঠত, যাঁর ভয়ে তাদের পোষা চন্দনাটা একটা কর্কশ ক্যা—চ শব্দ করে উঠত, সেই মানুষের হাসি ক্লান্ত মুখের বিবর্ণ ঠোঁঠ দুটির একটি বিষণ্ণতা-মাখানো রেখার টানে পরিণত হয়েছিল। আরতিকে কলেজের সময়ে বাড়িতে একটি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কলেজের বয়-ফ্রেণ্ড সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত বিরূপতা ছিল। বলতেন, "জাতিধর্ম আমি মানি না, মানব না। কিন্তু বংশ মানি। ফ্যামিলির পরিচয়টা আমার কাছে সব চেয়ে বড়। আই ডোণ্ট লাইক—আমার এটা আদৌ পছন্দ

নয় যে, আমার মেয়ে কলেজে গিয়ে অজ্ঞাত-কুলশীল সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, এবং পরিশেষে এসে বলবে, 'বাবা—আমি একে ভালবেসেছি, ওকেই বিয়ে করতে চাই।"

তিনি যখন কথা বলতেন, তখন যে-ই থাক ঘরে, স্তব্ধ হয়ে যেত তাঁর আন্তরিকতার দৃঢ়তায়, তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বেও বটে। তিনি খানিকটা পায়চারি করে, আবার বলতেন, "আমার মেয়ে যদি তা করে, তবে কামনা করব,তার আগে যেন আমার মৃত্যু ঘটে।"

তার বাবার সেদিনের সেই মুখচ্ছবি আজও তার চোখের উপর ভাসছে। তাঁর মুখের চেহারা মুহূর্তে যেন শবের মুখের মত পাণ্ডুর হয়ে উঠেছিল। নিঃশব্দেই তিনি বেরিয়েই যাচ্ছিলেন, কিন্তু আরতিই ডেকেছিল, "বাবা!"

তিনি উত্তর দেন নি, শুধু দাঁড়িয়েছিলেন।

"ইনি আজ আমাকে বড় অপমান থেকে বাঁচিয়েছেন বাবা "

"অপমান থেকে?" এবার অমৃত সেন ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, "কী হয়েছিল?"

"একটা বখে-যাওয়া ছেলের দল—সবের মধ্যেই ভাল মন্দ আছে তো, ছাত্রদের মধ্যেও আছে—তারাই কজনে—তাদের সঙ্গে আগে বোধ হয় মিস্ সেনের কিছুটা ঝগড়া বা মতান্তর হয়েছিল, সেই আক্রোশে তারা বাইরে থেকে একটা অত্যন্ত বখে-যাওয়া ছেলেকে ডেকে এনেছিল—।"

"আপনি? আপনি কে? আপনার তো মিলিটারি পোশাক দেখছি।"

"ইউ টি সি'র পোশাক এটা। আমি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। ইউনিভারসিটিতে এসেছিলাম আমাদের কোরের কর্তার ডাকে।"

এবার আরতি বলেছিল, "উনি দাদাকে চেনেন বাবা। আমাকে দেখেই বললেন, আপনি তো রথীনবাবু—মানে রথীন সেনের বোন। আপনাকে অনেকবার দেখেছি আমাদের হোস্টেলে—দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।"

এবার প্রসন্ন হয়েছিলেন তার বাবা। একখানা চেয়ারে বসে বলেছিলেন, "আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ, ইয়ং ম্যান। আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি।"

"প্রবীর চ্যাটার্জী।"

"বাড়ি?"

"বাড়ি ছিল এককালে বর্ধমান জেলায়। কিন্তু সে সব আর নেই। ঠাকুরদা চাকরি করতেন, তারপরে বাবা চাকরি করেছেন। তাঁরই সঙ্গে প্রথম জীবনটা জেলায় জেলায় ঘুরেছি, তার পর দিল্লীতে—"

"দিল্লীতে? কী চাকরি?"

"সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টে ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন। বছরখানেক হল মারা গিয়েছেন।'

"মা আছেন নিশ্চয়ই?"

"না। মা মারা গিয়েছেন অনেকদিন হল। দাদা আছেন। তিনিও দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন।"

"আই সী—"একটু চুপ করে থেকে হেসে বলেছিলেন, "আমার থিয়োরি সত্য হয়েছে। আমার একটা থিয়োরি আছে। মা-বাপ উচ্চশিক্ষিত—উচ্চশিক্ষা বলতে আমি ইংরেজী শিক্ষা এবং সহবত বুঝি—না হলে ছেলে কখনও ভাল হয় না। একসেপশন অবশ্য আছে। কিন্তু—"

তারপর অনেক কথা হয়েছিল।

তার মধ্যেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ইঞ্জিনিরারিং পাশ করে কী করবে? মানে স্বাধীনভাবে ব্যবসা—না—চাকরি?"

হেসে প্রবীর বলেছিল, "আমার ভারি ইচ্চে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ট্রেনিং নিয়ে মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে ঢুকি। দেয়ার ইজ লাইফ—"

"ইয়েস, দেয়ার ইজ লাইফ।"

"এখন যুদ্ধের মধ্যে ঢোকারও সুবিধে আছে।"

"নিশ্চয়। ভেরি গুড আইডিয়া। ভেরি গুড। আমি খুব খুশী হলাম যে, দীজ পোলিটিক্যাল ইজ্‌ম্‌স্ তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে নি।

"আই হেট পলিটিক্‌স।"

আবার তার ঠোঁট উল্‌টে গিয়েছিল।

"মিলিটারি লাইফ তোমার স্যুট করবে? পছন্দ কর তুমি?"

"ভী-ষ-ণ! সেণ্টিমেণ্ট-ফেণ্টিমেণ্ট আমি বরদাস্ত করতে পারি নে। আমার কাছে মিলিটারি লাইফ আইডিয়াল লাইফ। সারাটা দিন কাজ করলাম, সন্ধ্যায় একটু ক্লাবে গেলাম, তারপর সারারাত্রি সাউণ্ড স্লীপ। যুদ্ধের সময় জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাজ

করব, বুলেট ছুটবে, শেল ফাটবে, এয়ার-রেড হবে, এর চেয়ে থ্রিল আর কিছু আছে? বুলডোজার চালিয়ে এক-একদিনে রাস্তা তৈরী করব, এক সপ্তাহে নদীর উপর ব্রিজ তৈরি করব, পাহাড় কাটব। আই লাইক ইট ভেরি মাচ।"

"ভেরি গুড। ভেরি গুড। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, কল্যাণ হোক তোমার। এবং আমি বলতে পারি, তোমার উন্নতি হবেই!"

এর পরই প্রবীর উঠেছিল। "আই অ্যাম লেট। আমি আজ যাই।"

"আবার এস সময় পেলে। রথীনকে জানতে তুমি—"

"দাদা বলতাম তাঁকে। আমাদের সিনিয়র তো!"

"তা হলে তুমিও আমার ছেলের মত। তার উপর তুমি আরতিকে আজ—"

"ও সামান্য ব্যাপার। ইউনিভারসিটির অন্য ছেলেরা থাকলে এটা কখনও ঘটতে পেত না। তারা পলিটিক্স নিয়ে মেতে মিটিং করছে তাদের সেই অ্যাবসেন্সের সুযোগে—"

"ওঃ, দীজ পলিটিক্স্!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন তার বাবা। তারপর বলেছিলেন, "তবুও আমার কৃতজ্ঞতার কারণ আছে। জলে ছেলে পড়ে গেলে যে-কোন বয়স্ক লোক তুলতে পারে। সেটা ঠিক কথা। কিন্তু যে তোলে, মা-বাবার কৃতজ্ঞতা তারই কাছে।"

হেসেছিলেন অমৃতবাবু। "যাও আরতি, প্রবীরকে এগিয়ে দিয়ে এস।"

দরজার গোড়ায় আরতি অনুরোধ জানিয়েছিল, "আবার আসবেন কিন্তু।"

"আসব সময় পেলে। কিন্তু—"

"কিন্তু কিছু নেই এর মধ্যে।"

"আসবার কথায় কিন্তু নয়। আপনার কথায়। আপনি এর পর ইউনিভারসিটিতে একটু সাবধান হবেন।"

"আপনি ইউনিভারসিটিতে পড়লে ভাল হত।" হেসে বলেছিল আরতি।

সে-ও হেসেছিল। তারপর নমস্কার করে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধের পোশাক-পরা প্রবীর দীর্ঘ পদক্ষেপে গলির মুখে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

ঘরের মধ্যে আসতেই তার বাবা বলেছিলেন, "আইডিয়্যাল ছেলে; এমনি ছেলেই আজ চাই।"

একমুহূর্ত পরে মধ্যে মধ্যে থেমে থেমে বলেছিলেন, "কাল থেকে তুমি আর ইউনিভারসিটিতে যাবে না। আমার ইচ্ছে—তুমি বি-টি ক্লাসে ভর্তি হও। তারপর প্রাইভেটে এম-এ দিও। আমি আজ সর্বস্বান্ত। এই বাড়িখানা ছাড়া যা ছিল, সব শেষ আজ। তোমাকে চাকরি করেই খেতে হবে। কারণ রথীনের খরচের জন্য এ-বাড়িও হয়তো—।···এমনি ছেলে পেলে—।···কিন্তু তোমার বিয়েই আমি দিতে পারব না। কী দেব তোমার বিয়েতে?···না। শুধু হাতে—সে পারব না। কিন্তু আশ্চর্য ছেলে—ব্রিলিয়ান্ট বয়। রথীনের চেয়েও ব্রিলিয়ান্ট।"

এই ড্রাইভারের হাতে শেয়ালের কামড়ের দাগ; ঠোঁট দুটিও ঘৃণায় ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে উল্‌টে যায়। কিন্তু তবু এই ড্রাইভার সই প্রবীর চ্যাটার্জি? তাই কি হয়?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব কথা মনের মধ্যে ভেসে গেল। তার স্তম্ভিত-মগ্ন মন ওই প্রশ্নের সামনে অন্ধকার রাত্রে আপন ঘরের সন্ধানে কোন এক অজ্ঞাত ঘরের রুদ্ধ-দ্বারে আকুল আকুতিতে করাঘাত ক'রে দাঁড়িয়ে গেল।

ততক্ষণে রতন ড্রাইভার আরতিকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রচুর গ্যাস ছেড়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচণ্ড বেগে গাড়িখানাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তখনও তার ছোট মামাতো-ভাই লাটু চিৎকার করছে; উপরের বারান্দায় তার মামা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করছেন, "কী হয়েছে? কী? লাটু এত চিৎকার করছ কেন?" তার পরেই আরতিকে দেখে বলে উঠেছিলেন, "আরতি! তুই বেঁচে আছিস? ভাল আছিস? বউমা! বড় বউমা!"

বড় বউ অর্থাৎ বড় মামাতো-ভাইয়ের স্ত্রী বেরিয়ে এসেছিল, "বাবা!"

"আরতি! আরতি এসেছে।"

সুধা-বউদি ছুটে নেমে এসেছিল। এই বউদিদিটির সঙ্গে আরতির আর একটি সম্পর্ক ছিল। সে তার পিতৃবন্ধুর কন্যা। তার বড় মামাতো-ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন তার বাবা। তা ছাড়াও মেয়েটি তেজস্বিনী। স্বামীর সমস্ত অনাচারকে উপেক্ষা করে, সকল দুঃখ বুকে চেপে এই বাড়ির মর্যাদা সে ধরে রেখেছে।

বৃদ্ধ শ্বশুরের সে মায়ের অধিক। এ-সংসারের সকল কর্তব্য, সকল ন্যায়, এই একটিমাত্র মেয়েকে আশ্রয় করে আজও বেঁচে আছে।

আরতিকে সে-ই সাগ্রহে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—"আয়! আয়!"

তার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল, "আরতি? কী হয়েছে রে? তোর মুখের চেহারা এমন কেন? আজ ক'দিন কী ভাবনাই ভেবেছি। যত বাবা ভেবেছেন, তত আমি! কেঁদেছি। ওই কপালিটোলায় বাড়ি—। আর এই দাদা—এদের ছুই ভাইকে ব'লে ব'লে কাল থানা থেকে খোঁজ করিয়েছিলাম। শুনলাম, বাড়িটা লুঠ হয়েছে নিঃসন্দেহে। এখন আর কেউ নেই। আমি ভেবেছিলাম, তুই বেঁচে নেই। এদিকে গুজবের তো শেষ নেই। কেউ বলে, গাড়ি গাড়ি লাস গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। কেউ বলে, গাড়ি গাড়ি মেয়েছেলে কোথায় নিয়ে চলে গেছে। ভাই ছুটো কালাপাহাড়। বাবা কেঁদেছেন আর আমি কেঁদেছি। কি ক'রে বাঁচলি তুই?"

আরতি এতক্ষণে বলেছিল, "সে আর জিজ্ঞাসা কর না বউদি। সে যে তিন রাত্রি ছুদিন কীভাবে গেছে! মরে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য ছিল না। বাঁচাই আশ্চর্য! সে এখন বলতে পারব না, শুধিও না। যাঁরা দিয়ে গেলেন, তাঁরাই কাল উদ্ধার করেছিলেন। আমি একটু শোব বউদি!"

ঘরটা খুলে দিয়ে তাকে শুইয়ে বউদি বলেছিলেন, "ঘুমো। কিছু খাবি নে?"

"না।"

"বেশ ; ঘুম ভাঙলে ডাকিস। কিন্তু—"

"বল।"

"সন্ধ্যে তো হয়ে এল। গা-টা ধোয়া হয় নি। ধুয়ে নে। শরীরটা অনেক সুস্থ হবে। চান করবি? যা চেহারা হয়ে আছে।"

"হ্যাঁ বউদি, সেটা ভাল বলেছ।"

"আমার বাথরুমে আয়। বালতিতে গঙ্গাজল আছে। দু ঘটি মাথায় ঢালিস।"—অর্থটা আরতি বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল সারাটা মন। বলেছিল, "না বউদি। তার দরকার হবে না। আমি বুঝেছি, যা বলছ।"

বউদি বলেছিল, "বাঁচলাম ভাই। তবে সাবান মেখে ভাল করে চান কর। কাপড়-চোপড় কী নিবি নে। বাথরুমের পাশের ঘরটাতেই আলমারিতে আছে।"

বাথরুমে ঢুকে মনে পড়েছিল প্রবীরেরই একটা কথা।

"কলকাতার এত নর্দমার জল গঙ্গায় পড়েও গঙ্গার জল অপবিত্র হয় না যখন শুনি, এবং সেই গঙ্গায় চান করে পবিত্র হওয়ার ধুম দেখি, তখনই বুঝতে পারি, গঙ্গায় এত ইলিশের ঝাঁক কী করে আসে। এরা মরে সব গঙ্গার ইলিশ হয়।"

তার পরই বলেছিল, "এই কারণেই রামভক্ত গান্ধী এদের নেতা ; আই-সি-এস সুভাষচন্দ্র নিত্যি কালীপুজো করেন।"

বাথরুম থেকেই সে ভাবতে শুরু করেছিল। স্নান সেরে ঘরে শুয়েও তাই ভাবছে। একজনকে ভাবতে গেলেই অপরজনকে মনে পড়ছে। কিন্তু এ কি সত্যি হতে পারে? ওই ড্রাইভারটি কি—?

॥ পাঁচ ॥

সমস্ত রাত্রি আরতি ঘুমোয় নি। তার মনের মধ্যে ওই অসম্ভব রকমের দুটি অসম পর্যায়ের মানুষের বিচিত্র সাদৃশ্যের কথাই শুধু আলোড়িত ক'রে তুললে। ঘুম এলো না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত দাঙ্গার কোলাহল শোনা যাচ্ছে। গভর্ণমেণ্ট সৈন্যদের হাতে কলকাতা শহর তুলে দিয়েছে। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত করফ্যু জারী হয়েছে। তবুও দূর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সমবেত কণ্ঠে দাঙ্গার স্লোগান উঠছে। 'বন্দে মাতরম্।' 'জয় হিন্দ্!' 'আল্লাহো আকবর!' 'নারায়ে তকদীর!' মধ্যে মধ্যে রাইফেলের গুলি ছুটছে। মিলিটারী লরী ও ভ্যান প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছে। এ অঞ্চলটা হিন্দুর পক্ষে নিরাপদ। কিন্তু উত্তেজনায় সমান অধীর। কখনও বা ছাদ থেকে ছাদে কথা চলছে। "ও আগুনটা কোথায় জ্বলছে বলুন তো? ওই যে ওই কোনে!"

এরই মধ্যে বিনিদ্র চোখে ভাবছিল প্রবীরের কথা।

·

তিন বৎসর প্রবীর নিরুদ্দেশ। ইস্টার্ণ ফ্রণ্টে চলে যাওয়ার পর খান দুই পত্র পেয়েছিল। তারপর আর কোন সংবাদ পায় নি। কত রাত্রি সে বসে বসে প্রবীরের কথা ভেবেছে। কতদিন তার মৃত্যু হয়েছে মনে হতেই কেঁদেছে। ইউনিভারসিটির ওই ঘটনা সূত্রে যে আলাপ সে আলাপ দাদার সম্পর্ক ধরে গড়া হয়েছিল। প্রথম দিন প্রবীর চলে গেলে মনে একটু মিষ্টি হাওয়া বয়েছিল।

সে দিন বাকী দিন ও রাতের সব সময়টাই মন যেন প্রসন্ন লঘু হয়ে থেকেছিল। পরের দিন সে ইউনিভারসিটিতে যায় নি। সে দিন সকালেই কাগজে খবর বেরিয়েছিল-যে নাৎসীরা লণ্ডনে সারা রাত্রি ধ'রে প্রায় বিমান আক্রমণ চালিয়েছে। বাবা অধীর হয়ে উঠেছিলেন। রথীন, রথীন, রথীন! যে বাবা কখনও কোষ্ঠী বিশ্বাস—সুসময়, দুঃসময় বিশ্বাস করেন নি—তিনিও সেদিন বলেছিলেন—দুঃসময়! এত বড় দুঃসময় আমার জীবনে আসে নি। ব্যবসা গেছে, বাড়ি দু'খানা গেছে। শেষে যদি রথীনও—। কথা শেষ করতে পারেন নি, দুহাতে মুখ ঢেকে হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলেছিলেন দুপুরের পর বলেছিলেন, "আমি বেরুচ্ছি আরতি। ফিরতে সন্ধ্যে হতে পারে।"

আরতি প্রশ্ন করেছিল, "কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

"টাকার জোগাড়ে মা। টাকা জোগাড় করে আমি রথীনকে পাঠাতে চাই। সে ফিরে আসুক। না-হলে—"

বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। না গিয়ে উপায় ছিল না! বাড়ির টেলিফোনটা তখন গিয়েছে। যুদ্ধের জন্য গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিয়েছে। ইংরেজ জাতটা তখন যায় যায়। ওদিকে ইংলণ্ড নাৎসী বিমানের আক্রমণে নিত্য বিধ্বস্ত হচ্ছে; এদিকে জাপানী সৈন্য মালয় উপদ্বীপ ধরে দ্রুততম গতিতে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সিঙ্গাপুর ভেঙে পড়েছে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার মত। ইংরেজ সৈন্য পালাচ্ছে; সৈন্যবিভাগ থেকে বলছে সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণ। এমনই সুশৃঙ্খল যে মার্চ ক'রে ক'রে সৈন্যরা প্রায় নেতিয়ে পড়েছে

যুদ্ধবিভাগ থেকে বলা হয়েছে, 'আমাদের সৈন্যরা এমনই ক্লান্ত যে খেতে বসে তারা ঘুমিয়ে পড়ছে।' রেঙ্গুন এবং বার্মার অন্যান্য স্থান থেকে এদেশের প্রবাসীরা পিঁপড়ের মত সারি বেঁধে দুর্গম পার্বত্য পথে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কলকাতায় একটা আতঙ্ক এসেছে শীতকালের শীত প্রবাহের মত। দিনে দিনে সেটা ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে—রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে শীতপ্রবাহের ঘন থেকে ঘনতর হওয়ার মত। কলকাতার লোক কলকাতা ছেড়ে পালাবার আয়োজন করছে। ওদিকে কংগ্রেস ভারত ছাড় আন্দোলনের ভূমিকা তৈরী করছে। কলকাতায় ইংরেজ অ্যামেরিকান-নিগ্রো আফ্রিকান সৈন্য ভরে গেছে। জীবন হয়েছে অস্থির—পদ্মপত্রের জলের মত। অন্যদিকে একদল মানুষ যুদ্ধের সুযোগে কালো বাজারে লাখে লাখে টাকা উপার্জন করছে। তার মামাতো ভাইরা এর সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু তার বাবা হলেন সর্বস্বান্ত। তিনি কিছুতেই ওদের কাছে যাবেন না।

আরতি একা বাড়িতে বসে ভাবছিল বাবার কথা। অসুস্থ শরীরে ভগ্ন মন নিয়ে তিনি বেরিয়েছেন। তার কোন সাধ্য নেই যে সে সাহায্য করে। যেটুকু ছিল তা সে করেছে; তার গায়ের গয়না সব খুলে দিয়েছে। বাবাকেও তা নিতে হয়েছে। চোখের জল ফেলেই তা তিনি নিয়েছেন।

ঠিক এই সময়ে বাড়ির দরজায় ইলেকট্রিক বেল টিপেছিল কেউ। উপরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিচের দিকে ঝুঁকে দেখে সে প্রথমটায় চিনতে পারে নি কারণ ছিল। সেদিন আর প্রবীর

ইউ-টি-সির পোশাকে আসে নি। সে দিন তার পরণে ছিল চমৎকার হাল্কা গ্রে রংয়ের স্যুট।

তাতে তার চেহারাটাই অন্যরকম দেখাচ্ছিল। প্রথমটায় সে চিনতেই পারে নি। ছিপছিপে লম্বা, টকটকে রঙ, অবিন্যস্ত ভঙ্গিতে সুচারু বিন্যাসে বিন্যস্ত শ্যাম্পু করা চুল; টাইটা ছিল নীল। তার পাশেই ছিল গাঢ় রাঙারঙের একটি আধফোটা গোলাপ। উঁকি মেরে দেখে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে বসছিল, "কাকে চাই?" ইংরেজীতে প্রশ্ন করেছিল। দেশী ক্রীশ্চান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়াটায় এমন মধ্যে মধ্যে ঘটে। বিশেষ করে বাড়িটা মডার্ণ এবং ফ্যাশনেবল বলে একটু সম্ভ্রান্ত ফিরিঙ্গী হলেই নম্বর না দেখে এ বাড়ির কলিং বেল টিপে বসে। সে হিসেবে প্রথমেই তাকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মনে করে নিয়েছিল। প্রবীরের পিঙ্গল চোখ দুটি ঝিকমিক করে হেসে উঠেছিল। কিন্তু কোন রসিকতা না করে সম্ভ্রমভরেই বলেছিল, "আপনাকেই।" বলেছিল বাংলাতে।

এক মুহূর্ত। তার পরই চিনতে পেরেছিল সে, "আপনি! ও-মা!" তার পরই ছুটে নেমে এসেছিল। দোর খুলে দিয়ে বার বার মাফ চেয়েছিল সে। "আসুন—আসুন!" বলে আহ্বান জানিয়েছিল।

বাড়ির মধ্যে ড্রয়িং রুমে বসে সহাস্যে বলেছিল, "আজও ইউনিভারসিটিতে এসেছিলাম। তা সুব্রতদের দেখা পেলাম না। ভেবেছিলাম বোঝাপড়া হবে। তা হল না। ফিরবার পথে ভাবলাম আপনাকে বলে যাই কথাটা।"

আরতি বলেছিল, "আপনি আজ আবার সুব্রতদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছিলেন? কিছু মনে করবেন না—আপনি তো খুব ঝগড়াটে লোক!"

প্রবীর বলেছিল, "হ্যাঁ, ও সুনাম আমার আছে। তবে এইটুকু বিশ্বাস করুন ঝগড়া যা করি—সে অন্যায় সমর্থনের জন্যে করি না। অবশ্য নিজের বিচার আছে। আর আপনার ক্ষেত্র তো আলাদা। এক্ষেত্রে ঝগড়া না করলে নিজেকে মানুষই বলার অধিকার থাকত না আমার। আপনি শুধু তো একটি মেয়েই নন—আপনি রথীনদার বোন।"

আরতি বলেছিল, "তা মানলাম। কিন্তু কালকের কথা বলছি নে। আজ যে সেজে গুজে ঝগড়া করতে এসেছিলেন—সেই জন্যে বলছি। এ তো যেচে ঝগড়া করতে আসা।"

"হ্যাঁ। তা বলতে পারেন। এ দিক দিয়ে আমাকে মধ্য-যুগীয় বা পুরাণ-যুগীয় বলতে পারেন। আমি যুদ্ধে নামলে কতক গুলো সে যুগের নীতি মেনে চলি। আমি খেলতে পারি, ফুটবল ভাল খেলি, কিন্তু ফাউল ক'রে খেলি নে। তবে ফাউল ক'রে মারলে আমি তার শোধ নেবই। অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করলে ক্ষমা করি। তারপর কেউ মুখ-খারাপ ক'রে গাল দিলে আমি মুখ খারাপ করি নে, তার মুখে থাবড়া মারি। অতঃপর যত দূর সে চলে আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে যাই। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে—সে চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করি এবং যথা-সময়ে যথা-স্থানে যুদ্ধ দেবার জন্য উপস্থিত হই। কাল গেটের কাছে ওদের দল আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

সুতরাং আমি এসেছিলাম। ওরা কেউ আসে নি বা ওদের দেখা যায় নি। আমি অবশ্য টেলিফোন করে স্টুডেন্টস কংগ্রেস স্টুডেন্টস ফেডারেশনের পাণ্ডাদের ব্যাপারটা জানিয়ে ছি-ছিকার করেছিলাম। বলেছিলাম তোমাদের দেশোদ্ধারের চরণে প্রণাম—তোমাদের এলাকায় এই ঘটে! যদি বল—তোমরা কেউ ছিলে না কাল—তবে বলব সাদা কম্বলের মধ্যে কালো পশম যে-কটা সে-কটা তো কালই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে নি; ও কালো তো বরাবরই কালো চেহারা নিয়ে রয়েছে। তুলে ফেলতে পারতে! ওরা খুব লজ্জিত হয়েছে। এবং এ সম্পর্কে ওরা এরপর থেকে খুব কড়া হবে। অর্থাৎ আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কলেজে যাবেন। সাক্ষাতেও কথাগুলো হল। তাই বলতেই এসেছি। তবে—ওদেরও কিছু বলবার আছে।"

আরতি বলেছিল, "কি সেগুলো?"

"মানে ওরা বলে আপনি একটু বেশী সাজ সজ্জা করেন। একটু কম মেলামেশা করেন। একটু অহংকৃত। অবশ্য ওদের কথা—আমার নয়।"

আরতি একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "আমি হয়তো আর ইউনিভারসিটি যাব না। বি টি কোর্স নিয়ে ওখানে ভর্তি হব। আমার বাবা আজ পাগলের মত বেরিয়েছেন হাজার কয়েক টাকার জন্যে। দাদাকে পাঠাবেন, তাঁর ফেরবার খরচের জন্যে। কাল বোধ হয় বলেছি যে বাবা সর্বস্বান্ত হয়েছেন প্রায়। গাড়ি—দু'খানা বাড়ি তার সঙ্গে আমার মায়ের আমার যা গয়না ছিল সব বিক্রী

করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক করেছিলেন সেটা ফেল হওয়ায় ওঁকে এ্যারেস্ট করেছিল। এখন যাতে আমার গহনা না-থাকার দৈন্যটা বাবাকে দুঃখ না দেয় তার জন্যেই আমি একটু বেশী সাজি। অবশ্য বাইরেও যে নিজেদের ফেল-পড়া অবস্থাটা ঢাকতে না-চাই তাও নয়।

অত্যন্ত সহজভাবেই কথাগুলি বলেছিল সে। কেমন ক'রে পেরেছিল তা সে নিজেই জানে না। তবে তার দাদাকে যে দাদা মনে ক'রে তাকে অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা করেছিল—তাকে আত্মীয় বা আপন জন ভেবে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। সেইটেই ছিল বোধ হয় এর কারণ। আরও বোধ হয় সকালে লণ্ডনের বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে দাদার জন্য উৎকণ্ঠাও আর একটা কারণ। এবং এর পর সেদিন যুদ্ধের কথাই বেশী হয়েছিল।

এর পর সে এসেছিল ২৬শে ফেব্রুয়ারী। তাদের বাড়ি জুড়ে জীবন জুড়ে নেমেছে এক পারাপারহীন অন্ধকার। সে অন্ধকারের যেন শেষ নেই, সে দিনের পর যেন অনন্তকালেও আর দিন নেই,—সব আলো নিভে গেছে, শ্বাসবায়ুও যেন কে হরণ করে নিচ্ছে, খবর এসেছে তার দাদা লণ্ডনের এয়ার রেডে মারা গেছে।

বাবা অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করেছেন—পাঠাবেন। রথীনকে চিঠি লিখেছেন—'তুমি যে ভাবে পার যা খরচ হয়—চলে এস, ফিরে এস। আমি আর এ উৎকণ্ঠা সহ্য করতে পারছি নে। আমার দিন বেশী বাকী নেই। আমি বড় কাতর। আমার অনুরোধ তুমি লঙ্ঘন করো না। আমার কেমন বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে—যে তোমাকে

দেখতেও আমি পাব না। তবু—ফিরে আসছ জানলে মৃত্যুর মধ্যেও আমি সান্ত্বনা পাব।' চিঠি চলে গেছে। টাকা যাবে। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল। বেলা তখন তিনটে।

টেলিগ্রাম খানা পড়েই বাবার মুখ দৃষ্টি কেমন হয়ে গেল। কাগজখানা হাত থেকে খসে পড়ল তিনি। কাঁপতে কাঁপতে অস্ফুট একটা—আঁ—শব্দ করে ঘুরে মেঝের উপর আছড়ে পড়ে গেলেন। সে চীৎকার করে ডেকেছিল, "বাবা—বাবা!"

বাবা নিঃসাড়।

গোটা বাড়িটায় এক চাকর ছাড়া কেউ নেই। তাকেই সে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিল। সব চেয়ে কাছে যে ডাক্তারকে পাওয়া যায়—তাকেই ডেকেছিল। পাড়ার ডাক্তার, পশারে ছোট, তিনি এ পাড়ায় মিঃ সেনকে চিনতেন—সম্ভ্রম করতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলেন। দেখে বলেছিলেন, "এ যে— । এ যে—সেরিব্রেল থ্রম্বসিস বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয় কোন আকস্মিক শকে। আচ্ছা আমি আপনাদের ডাক্তার বি. সেন মশায়কে খবর দিচ্ছি। তিনি এসে দেখুন। ততক্ষণ একজন নার্স বরং ব্যবস্থা করে দি, কি বলেন?" সে বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করে প্রশ্ন করেছিল—"আর কি জ্ঞান হবে না?"

"না—না। তা হবে না কেন। তবে বাঁ দিকের শিরা ছিঁড়েছে মনে হচ্ছে। হয়তো—প্যারালিসিস হয়ে যাবে। আমি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি। আপনাকে কিন্তু শক্ত হ'তে হবে। আপনার জন মানে আত্মীয় স্বজনদের খবরটা দেওয়াও উচিত মিস সেন।"

আত্মীয় স্বজন। সংসারে আত্মীয় যে কে—স্বজন যে কে—এ তো সম্পর্ক ধরে বিচার করা যায় না। তবে হ্যাঁ সামাজিক সম্পর্ক একটা সূত্র বটে। সেই সূত্র ধরে আজ এই দাঙ্গার দুর্যোগের মধ্যে মামাদের বাড়িতে এসেছে, বাধ্য হয়ে এসেছে, হয়তো সমাজের দেওয়া একটা দাবীও আছে—তবু অস্বস্তির সীমা নেই, এই রকম বিছানা এই নিরাপদ ঘর যেন একটা উত্তাপে ভরা মনে হচ্ছে; লাটুর প্রথম সম্ভাষণের কটু কথাগুলো এখনও অন্তরকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছে। তবু এরাই আত্মীয়! সেদিনও এই এদেরই খবর দিতে হয়েছিল।

ওই ডাক্তারটিই নার্স একজন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আধঘণ্টার মধ্যে নার্সটি এসে মনে করিয়ে দিয়েছিল—"ডাক্তারবাবু বলে দিলেন উনি আপনাদের ডাক্তার বি. সেনকে খবর দিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন। আপনাকে আত্মীয়দের খবর দেবার কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছেন।"

হেয়ারস্ট্রীট থানায় গিয়ে ফোন করেছিল এই এদের! ধরেছিল সুধাবউদি। টেলিফোনে—বউদির গলা শুনে বেঁচে গিয়েছিল। সুধা তো শুধু বউদি নয়, সে তার নিজের দিদির মত, বাবার কন্যার মত—অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর কন্যা। এই সুধা বউদিকে নিয়েই ওই মামাতো ভাইদের সঙ্গে এমন বিরোধ। নইলে জীবনের চালচলনের যতই পার্থক্য থাক, তার মামা এবং বাবার মধ্যে অন্তরে অন্তরে যত অমিলই থাক, বাইরে একটা সৌজন্যও ছিল এবং খানিকটা মমতাও ছিল। মামা বাবাকে গরীবের ছেলে বলে অবজ্ঞা করতেন, তাঁদের বাড়িতে বিয়ে করে তাঁদের সম্পর্কে এসেই তিনি ধনী হয়েছিলেন

বলে একটা আনুগত্যও দাবী করতেন.অন্তরে অন্তরে ; আবার বাবা মামাকে ধনীপুত্র বলেই অবজ্ঞা করতেন, বনিয়াদী ধনীর ছেলেদের চাঁদের কলঙ্কের মত দোষগুলির জন্য ঘৃণাও খানিকটা করতেন; মধ্যে মধ্যে শালা-ভগ্নিপতির মধ্যে রসিকতাচ্ছলে বাক্যের বান হানাহানিও চলত। কিন্তু তাতে সম্পর্কচ্ছেদ হয় নি। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল—এই মামাতো ভাইদের নিয়ে। বড় মামাতো ভাইকে তার বাবাই একরকম বি. এ পাশ করিয়েছিলেন। সে আমলেও বার-দুই ম্যাট্রিক ফেল ক'রে পাতুদা পড়া ছেড়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলে তিনিই তাকেই নিজের কাছে এনে অবসর-মত পড়িয়ে উৎসাহ দিয়ে তৃতীয় বারেই ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে-ছিলেন। রোল নাম্বার নিয়ে অঙ্কপরীক্ষকের কাছ পর্যন্ত নিজে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর অবশ্য পাতুদা বি-এ পর্যন্ত নিজেই পাশ করেছিল। এবং এই বন্ধুকন্যা সুধার সঙ্গে তিনিই বিবাহের সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই হল কাল। সুধা বউদির রঙ কালো। পাতুদা তাকে অপছন্দ করল। এবং সেই অজুহাত ধ'রে চন্দ্রের কলঙ্ক-বিলাসের মত বংশগত পতিতা বিলাসের ধারাটি অবলম্বন করলে। যে দিন থেকে এ কথা বাবা জানলেন সেই দিন থেকে ওদের সঙ্গে তাদের এই সম্পর্ক। অবশ্য মামা বাবার কাছে অনেক মার্জনা চেয়েছেন এবং মামা সুধা-বউদিকে বাপের মত স্নেহ করেন কিন্তু তাতে বাবা মত বদলান নি। বাবাকে মামাতো ভাইরা যত ভয় করে তত ঘৃণা করে। সে নিজেও বাবার মতই এই ভাই দুটিকে ভাল চোখে দেখতে পারে না।

রথীন তার দাদাও পারত না। মামাতো ভাইরাও না। তবু সেদিন সুধা বউদিকে বললে, “বাড়িতে আমি একলা বউদি। অন্তত লাটুদা যদি এসে রাত্রিটা থাকে—।” বউদি বলেছিলেন, “নিশ্চয়, পাঠাচ্ছি। আমার তো উপায় নেই, নইলে আমিই যেতাম। ছেলেটা যে নেহাৎ কাঁচা। আমারও ঠিক সিঁড়ি ওঠা-নামার অবস্থা নয়। আর একটা কথা, টাকা-কড়ির দরকার আছে ?”

আরতির চোখ ফেটে জল এসেছিল এক মুহূর্তে; বলেছিল, “না।” বলেই টেলিফোন নামিয়ে দিয়েছিল। দাদার জন্যে সংগ্রহ করা টাকাটা বাড়িতেই রয়েছে। চোখ মুছে থানা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দরজায় এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন সত্যকারের আপনজনকে—আত্মীয়কে। বাড়ির দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল প্রবীর। সে-দিন তার পরনে ছিল ধুতি, টেনিস শার্ট।

“প্রবীরবাবু!” বলতেই সে কেঁদে ফেলেছিল।

প্রবীর বলেছিল, “হ্যাঁ, আমি অনুমান করেছিলাম। আমাদের প্রফেসর বোসের ছেলে শৌরীন ওই বাড়িতে থাকত। তিনিও টেলিগ্রাম পেয়েছেন। রথীনবাবুর সঙ্গেই তিনি পড়তেন।”

সে উত্তর কী দেবে ? শুধুই কেঁদেছিল।

প্রবীরই বলেছিল, “কান্না তো আছেই মিস্ সেন। সমস্ত জীবনই রইল। যে-বিপদ ঘটে গেছে, সে-বিপদ অতীত; তার জন্যে চোখের জল এখন সংবরণ করতে হবে, কারণ তার আঘাতে আর একটা বিপদ ঘটতে চলেছে। এই আশঙ্কা করেই আমি ছুটে

এলাম। আপনারা দুজনেই ভেঙে পড়বেন। কিন্তু এসে দেখছি বিপদ অনেক বেশী! চলুন, ভেতরে চলুন।”

রাত্রি আটটার সময় এসেছিলেন ডাঃ সেন।

প্রবীর নীরবে বসেছিল রোগীর ঘরের বাইরে।

বাবাকে দেখা শেষ করে—ভরসা দিয়েছিলেন ডাঃ সেন। বলেছিলেন, “বেঁচে যাবেন। তবে পঙ্গু হয়ে।” তারপর বাইরে এসে প্রবীরকে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন আরতিকে, “ও ইয়ংম্যানটি কে আরতি?”

আরতি উত্তর দিয়েছিল, “দাদার বন্ধু। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। আমাদের পরিবারের বন্ধু হয়ে গেছেন সম্প্রতি। দাদার খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। তারপর এই বিপদে আমাকে একলা দেখে আর যেতে পারেন নি।”

ডাঃ সেন খুশী হয়ে প্রবীরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তার বাবার মত ঈশ্বরে বিশ্বাস ডাঃ সেনেরও ছিল না, তবু সেদিন বোধ করি কী বলে প্রবীরকে শুভেচ্ছা জানাবেন খুঁজে না পেয়েই তার বাবার মতই বলেছিলেন, “গড উইল ব্লেস ইউ, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড। আমি ভাবছিলাম এঁদের জন্যে। বিশেষ করে আরতির জন্যে। আমারই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু—তা তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে। যখন দরকার হবে, তুমি থানায় গিয়ে আমাকে ফোন কর। আমি যাবার পথে থানা থেকেই ডি-সিকে ফোন করে অনুরোধ করে যাচ্ছি, যেন গেলেই ফোন করতে পাও। ও-সিকে বলে দেবেন তিনি।”

এরও খানিকটা পরে এসেছিল লাটু। বড় মামাতো ভাই সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে গেছে যথাস্থানে; লাটুর পোশাক দেখে মনে হল—সেও সেই পথে বেরিয়েছে—থাকতে আসে নি। কিন্তু তার জন্য আরতি আর চিন্তিত হয় নি। মানুষের আত্মীয় মানুষ; সত্যকারের আত্মীয়কে ডাকতে হয় না, সে অন্তরে ডাক শুনে আপনি আসে। লাটু প্রথমে এসেই—প্রশ্ন করেছিল প্রবীরকে নিয়ে। বাবার কথা নিয়ে নয়।

লাটু—তার ছোট মামাতো-ভাইও এসে প্রবীরকে দেখে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিল, "ইনি কে আরতি?"

আরতি ঐ একই উত্তর দিয়েছিল!

লাটু বলেছিল, "কই, পরিবার-বন্ধুকে রথীনদা থাকতে তো কোনকালে দেখি নি! নামও শুনি নি! কবে থেকে জুটল?"

কথাগুলি প্রবীরের সামনে হয় নি, পাশের ঘরে হচ্ছিল; কিন্তু এমন জোরে বলছিল লাটু, যাতে পাশের ঘরে, পাশের ঘরে কেন, বাড়ির সকল ঘর থেকেই সকলে শুনতে পায়।

আরতি ক্রুদ্ধ চাপা গলায় বলেছিল, "চুপ কর—উনি শুনতে পাবেন।"

"পেলেন তো পেলেন। আমি কাউকে খাতির করে কথা বলছি না।"

"খাতির কর বা না-কর, অনধিকার চর্চা করার তোমার অধিকার নেই।"

"আই সী; তা হলে অনেকদূর এগিয়েছে!" বলেই, "শুনছেন

মশাই!" বলে বেরিয়ে গিয়েছিল লাটু প্রবীরের কাছে। আরতি পিছনে পিছনে এসে লাটুকে কোন কথা বলবার আগেই, লাটু প্রবীরকে বলেছিল, "আপনাকে বলছি!"

প্রবীর মুখ তুলে তার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, "বলুন।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে-সাহায্য করেছেন তার জন্যে। এখন আপনি আসুন, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি।"

"ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মিস্ সেন কোথায়? তিনি না-বললে তো আমি যাব না।"

"আমি তার মামাতো-ভাই।"

"শুনেছি। নমস্কার। কিন্তু মিস্ সেন না-বললে আমি যেতে পারব না।"

"আপনি যাবেন। আমি বলছি!"

"মাফ করবেন—মিস্ সেন না বললে আমি যেতে পারব না। কারণ আমি শুনেছি, আপনি ড্রাইভারকে আধঘণ্টা পরেই হর্ন দিয়ে আপনাকে ডাকতে বলে বাড়িতে ঢুকেছেন। ড্রাইভার এখনই হয়ত হর্ন দেবে। আপনি থাকবেন না। সুতরাং আমি তো এই বিপদে একলা রেখে যেতে পারব না। ওই! আপনার ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। যান, আপনার দেরি হচ্ছে।"

"না-না! আপনি যাবেন মশায়! আপনি গেলেন দেখে তবে আমি যাব। সম্পর্কহীন যুবকের সঙ্গে এক বাড়িতে—"

আরতিও আর থাকতে পারে নি; সে ক্ষোভে রাগে অধীর

হয়ে বেরিয়ে এসে বলেছিল, "লাটুদা, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও। তুমি তো থাকতে আস নি। তুমি এসেছ, খোঁজ নিয়েছ, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে আমি দিচ্ছি। হাত জোড় করে বলছি, বাড়িতে এসে বাড়ির অপরাধ করে দিও না আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে।"

লাটু এর পর বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।—"ভেরী ওয়েল। প্রয়োজন নেই সে আমি বুঝেছি।"

আরতি মার্জনা চেয়েছিল, "কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি মার্জনা চাচ্ছি।"

হেসে প্রবীর বলেছিল, "ছি-ছি-ছি! কী বলছেন এ-সব! আমাকে যদি সত্যিই বন্ধু ভাবেন, তবে মার্জনা কেন চাইবেন? না-না-না। যান আপনি, দেখুন, বাবাকে দেখুন।" আবেগহীন অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে একটু মৃদু হেসে কথা ক'টি বলেছিল।

সমস্ত রাত্রি প্রবীর ওই চেয়ার একভাবে বসেছিল। শুতে অনুরোধ করলেও শোয় নি। বলেছিল, "ঘুমুই তো রোজই। আর এই উৎকণ্ঠার মধ্যে ঘুম আসবেও না। আপনি যান।"

শেষরাত্রে একবার মাত্র সে বেরিয়ে দেখেছিল, চেয়ারের পিছনে মাথা রেখে চোখ বুজেছে প্রবীর। নইলে যতবার উঠেছে, ততবার সে তার সাড়া পেয়েছে।

সকাল বেলায় সে বিদায় নিয়েছিল। তখন তার বাবার অবস্থা ভালোর দিকে।

তিনটি পদক্ষেপ। তিন দিনে তিনবার আসায় তিনটি পদক্ষেপ।

প্রথম পদক্ষেপ ইউনিভারসিটির ঘটনার দিন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ তার পরদিন। তৃতীয় পদক্ষেপ বাবার অসুখের দিন। সেই দিনই সে তাদের পরমাত্মীয় হয়ে গিয়েছিল। তার পর ধীরে ধীরে বাবা জীবনের আশঙ্কা কাটিয়ে উঠলেন। এর মধ্যে—প্রবীর নিত্যই প্রায় খোঁজ করেছে। তার মধ্যে বিলাস ছিল না, মোহ ছিল না, বেদনাভরা আত্মীয়তার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারই মধ্যে—এই সহজ যাওয়া-আসার মধ্যে হঠাৎ একদা—অতি অকস্মাৎ একদিন যেন মনে হয়েছিল, তার অন্তরতম প্রকোষ্ঠটির দরজার বাইরে কে যেন হাত দিয়েছে। হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, আঘাত দিয়ে ডাকবে কি না। সেও অপেক্ষা করে রইল, ডাকুক। একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষের অর্গলে হাত দিয়ে ভিতরে সে এবং বাহিরে প্রবীর —পরস্পরে শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে কোন একটা কিছুর ছায়া যেন পড়েছিল তাদের উপরে। এই পরস্পরের মেলা-মেশার অনেক অবকাশের মধ্যেও কোন দিন বা কোন বিশেষ সময় একটি আবেগের প্রকাশে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। একটি কারণ সে জানে। সেটি তার ভাগ্য-বিপর্যয়ের বেদনার প্রভাব। রোগশয্যায় শুয়ে তার পুত্রশোকাতুর সর্বস্বান্ত বাবা যেন সংসারের সব কিছুকে বিষণ্ণ করে রেখেছিলেন। অন্য দিকে প্রবীরের অসাধারণ ভদ্রতা-বোধ। আরও কিছু ছিল। প্রবীর তখন পরীক্ষা দিয়েছে। ফল সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল না। সে তখন যুদ্ধ-

বিভাগে চাকরি পাবার চেষ্টা করছে। এবং সেই আকাশ-মাটি-সমুদ্র ব্যাপ্ত করা প্রত্যক্ষ যুদ্ধকে সামনে রেখে কোন আবেগকে সে মুহূর্তের জন্য প্রশ্রয় দিত না।

একদিন আরতি, "বলেছিল আশ্চর্য মানুষ আপনি। আসেন যান—ঘড়ির কাঁটার মত। যেন ডিউটি দিচ্ছেন।"

প্রবীর হেসে বলেছিল—"অভ্যাস করছি। যুদ্ধের চাকরী পাবই। সেটাকে শাসনে রেখে কাজ করা অভ্যাস করছি। ডিউটি ছাড়া আর তো কিছু থাকবে না জীবনে।"

তবুও তারই মধ্যে কয়েকটি দুর্লভ দিনের স্মৃতি তার মনে আছে। শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের ঘন মেঘাচ্ছন্ন একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশীর রাত্রিতে চাঁদ ওঠার ক্ষণের মত কয়েকটি দিনের স্মৃতি।

তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতেও প্রবীর কখনও কখনও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। কখনও কখনও কর্মরতা আরতির দিকে এই দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবেই বসে থাকত। অবাক হয়ে দেখত। আরতির চোখে চোখ পড়লেও লজ্জিত হত না। কখনও কখনও সপ্রতিভভাবেই একটু হাসত। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে যেমন প্রসন্ন হাসি হাসে মানুষ, সেই প্রসন্ন হাসি। যে উদয়ে আলোকাভাস আছে রক্তরাগ নেই, তেমনি উদয়-মুহূর্তের মত সেই হাসি।

তারই মধ্যে একদিন।—

সেদিন সে নিজে বোধ হয় অন্তরে অন্তরে আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। প্রবীর তার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। আরতি

আত্মসম্বরণ করতে পারে নি—সলজ্জ হেসে বলেছিল, "এমনি করে কী দেখেন বলুন তো ?"

এখনও পর্যন্ত তাদের 'আপনি' 'তুমি' হয় নি।

প্রবীর বলেছিল, "আপনাকেই দেখি।"

"আমাকে ? আমার মধ্যে কী আছে দেখবার ?"

"আপনার মধ্যে একটা কিছু আছে, যা দেখতে ভালো লাগে। আপনার রূপ বলতে পারেন। তবে মানুষ রূপের মধ্যেই তো শেষ নয়—রূপকে ছাড়িয়ে আরও কিছু। বা রূপের অতিরিক্ত অনেক কিছু।"

"আমার রূপ তো নেই। আমি তো কালো। আর গড়ন-পিটনের মধ্যেও এমন কোন কিছু নেই, রূপের যে সংজ্ঞা আছে তার সঙ্গে যা মেলে। তবে তার অতিরিক্ত-কিছুর কথা আমি কি করে জানব বলুন।"

বাধা দিয়ে হেসে সে বলেছিল, "আমার একটি জানা ঘটনার কথা বলি শুনুন। একটু হয়তো সংসারে সমাজে যাকে দুর্নীতি-মূলক বলে, তাই আছে এর মধ্যে। তবে যদি সংস্কারকে সরিয়ে বিচার করেন তবে এর মধ্যে আশ্চর্য মানে পাবেন। আমাদের এক আত্মীয় বর্ধমান জেলার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। খুব উচ্চশিক্ষিত না হলেও বংশগৌরবের প্রভাবে বংশের দীক্ষায় ভালই ছিলেন। হঠাৎ তিনি উন্মত্ত হলেন একটি নিম্ন-জাতীয়া কালো মেয়েকে নিয়ে। ঘর ছাড়তে উদ্যত হলেন। শেষে ঘর ছাড়লেন। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিসের জন্য এমন পাগল হয়েছেন

তিনি ? কী দেখেছেন তিনি ওর মধ্যে ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমার চোখ দুটো যদি তোমাদের দিতে পারতাম তবে বুঝতে পারতে, দেখতে পেতে, কী দেখেছি। এক এক জনের এক এক রঙ ভাল লাগে। কিন্তু বলুন তো রূপের বিচারে মৌলিক রঙগুলোর কোন রঙটা কোন রঙের চেয়ে নিষ্প্রভ, মলিন ? রূপের মধ্যে এক অপরূপ বাস করেন। যে যার মধ্যে তাকে আবিষ্কার করে, তার রূপই তার ভালো লাগে। আপনার মধ্যে একটি সুষমা আছে। সে রঙ-গড়ন দুয়ের অতিরিক্ত কিছু।”

আরতির বুকের ভিতরে স্পন্দন বোধ করি আবেগের স্পর্শে নৃত্যচ্ছন্দোময় হয়ে উঠেছিল। সে হেসে বলেছিল, “আপনার চোখ দুটো ধার পেলে বড় ভালো হত। একবার আয়নায় নিজেকে দেখে সুন্দরী না হওয়ার মনের ক্ষোভটা মুছে ফেলতে পারতাম।”

“দেবার হলে নিশ্চয়ই দিতাম। এবং আমার চোখ পেলে আপনি আরও অনেক সুন্দরকে দেখতে পেতেন। আমার ছেলেবেলা থেকে রূপের একটা নেশা আছে। আকাশের চাঁদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। ফুলের বাগান ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। রূপবান আর রূপবতী যিনিই হোন, আমাদের বাড়িতে এলে তাঁর সঙ্গ ছাড়তে চাইতাম না। দেখুন না, ফুল না-পরে আমি থাকি না।” একটু থেমে হেসে বলেছিল, “আমার চোখ পেলে কিন্তু আপনি সেদিন ইউনিভারসিটিতে যে ছেলেটির খাতা-বই কেড়ে নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত করেছিলেন, তার প্রতি সহানুভূতি

অনুভব করতেন। মানে সে আপনার নামের যে-অক্ষরটা কেটে ছোট করে নিয়েছিল, সে অক্ষর বাদ দিতে আপনারই ইচ্ছে হত।"

ঠিক সেই সময়েই বাবা ডেকেছিলেন, নইলে সে জিজ্ঞাসা করত, "তার অর্থ কি এই হয় না যে, আপনার ওই নামে আমাকে ডাকতে ইচ্ছে করে?"

বাবা সেদিন আবার একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার পাশে থেকে সে তাঁর সেবা করেছিল। কয়েকবার দুপাশে দুজনে বসে পরস্পরের দিকে একই উদ্বেগ-নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সন্ধ্যার পর নার্সের ব্যবস্থা করে সে গিয়েছিল। সেই দিনই স্পষ্টভাবে সে অনুভব করেছিল, প্রবীর তার পরমাত্মীয়।

বিদায় দেবার সময় কথা খুঁজে না পেয়ে এ-দেশের একটা অত্যন্ত সেকেলে কথাই বলেছিল, "আর-জন্মে আপনি নিশ্চয় আমাদের কেউ ছিলেন।"

প্রবীর বলেছিল, "জন্মান্তর যদি মানেন, তবে বলতে হয়, আপনি এবং আপনার বাবা, দুজনে হয়তো গতজন্মে বাবা-মেয়ে ছিলেন না। আমি হয়তো একজনেরই পরমাত্মীয় ছিলাম। এ-জন্মে আপনাদের দুজনেই আমার পরমাত্মীয়। আসল কথা মমতা, মিস সেন। ওই পরম বস্তুটি কী করে যে জন্মায়, এবং কোথায় জন্মায়, এ বলা বড় শক্ত। ওই ওরই জোরে মানুষের ঘর-সংসার, মা-বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, সবই দাঁড়িয়ে আছে। ওতেই মানুষ কুৎসিতকে সুন্দর দেখে, গুণহীনকে গুণবান দেখে। 'তনয় যদ্যপি হয় অসিতবরণ, প্রসূতির

কাছে সেই কষিতকাঞ্চন।' আপনাদের সঙ্গে সেই পরম বস্তুতে বাঁধা পড়ে গেছি।"

বলে প্রবীর একটু হেসেছিল। আরতি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কথাগুলি বড় ভালো।

প্রবীরের কণ্ঠস্বরে অন্তরের অকপট প্রকাশ। অভিভূত হয়ে যাবারই কথা; তাই গিয়েছিলও, কিন্তু যেন একটা-কিছুর জন্য মনের গভীরে একটি বেদনা অনুভব করেছিল। যেন একটু অভিমান।

"আচ্ছা, আমি আসি আজ। কাল সকালেই খোঁজ নেব।"

চলে গিয়েছিল সে। তারপর সে যতক্ষণ জেগেছিল, উদাস হয়ে বসেছিল। জীবনের যত নৈরাশ্যজনক ভাবনা সব এক সঙ্গে তাকে চেপে ধরেছিল।

রুগ্ণ পঙ্গু বাবার ভাবনা। কী হবে? সংসারে কেউ সত্যকারের আপনার জন নেই, অথচ সম্মুখে গোটা জীবনটা পড়ে রয়েছে। সম্বল ফুরিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। রথীনের ফিরে আসবার জন্য বাবা যে টাকাটা বহু কষ্টে, বহু লজ্জা স্বীকার করে, আরতির মায়ের এবং কিছু আরতির গহনা বিক্রী করে সংগ্রহ করেছিলেন, রথীনের মৃত্যুতে সেটা পাঠাতে হয় নি। তাই আজও চলছে। তারপর?

ব্ল্যাক আউটের রাত্রি। আশেপাশের ফিরিঙ্গি-পাড়ায় সদ্য-আগত ইংরেজ-টমিদের ঘোরা-ফেরায় রাস্তাগুলি কিছু মুখর হয়ে থাকত। রাত্রে দরজা ভালো করে বন্ধ করে রাখতে হয়। দু-একটা মাতাল সেপাইয়ের স্খলিত কণ্ঠের গান, কি দু-একটা উচ্চ শব্দ, কি

হাসি মাঝে মাঝে বেজে উঠছিল। সেদিন খেতেও ভালো লাগে নি। রাত্রে ঘুমও ভালো হয় নি। সকালে বাবা ভালো ছিলেন। প্রবীর এসেছিল আটটা না বাজতেই। বাবা ভালো আছেন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিল, "যাক্ দুশ্চিন্তা নিয়ে যেতে হবে না। আজই আমি দিল্লী যাচ্ছি। সাহস করে থাকবেন কিন্তু। আপনি বিংশ শতাব্দীর মেয়ে।"

সেইদিনের কাগজেই খবর ছিল, গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

প্রবীর কাগজখানার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "সাবধানেও থাকবেন। ঝড় উঠল।"

ফিরেছিল প্রায় মাস দুয়েক পর। দিল্লী থেকে আরও কয়েক জায়গায় যেতে হয়েছিল তাকে। এর মধ্যে চিঠিও লিখেছিল একখানা। চিঠিতে লিখেছিল—'জীবনে যে-চাকরি যে-কর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তারই জন্য ঘুরতে হচ্ছে। কয়েক জায়গায় কয়েক রকম দেখা-শুনা, পরীক্ষা, ইণ্টারভ্যু।'

বাবা খুশী হয়েছিলেন। বাবা তখন আস্তে আস্তে যেন সেরে উঠছিলেন। কিন্তু সে ঠিক খুশী হয় নি। প্রতীক্ষা করেছিল তার ফিরে আসার। ফিরে এলে সে ভেবেছিল বলবে—'যুদ্ধের চাকরি ছাড়া কি জীবনের সাধ মিটবে না? যুদ্ধে জীবনের সাধ তো মৃত্যু। না—ও-কাজ নেবেন না।'

দু-মাস পর সে ফিরেছিল চাকরি নিয়ে; পরনে তার মিলিটারী

পোশাক—ক্যাপ্টেন র্যাঙ্কের ব্যাজ কাঁধে-বুকে। আরতি কথা বলতে পারে নি। বলেছিল প্রবীর—"কী যে দুশ্চিন্তা হত আপনাদের জন্যে, কী বলব! তবু ভরসা ছিল আপনার উপর। আপনি শক্তিমতী মেয়ে!"

আরতি শুধু বলেছিল, "চাকরি হয়ে গেছে?"

"পোশাক দেখছেন না। এখন লক্ষ লক্ষ বলির প্রয়োজন, এখন বাছাবাছির কড়াকড়ি নেই। যে-কোন দিন ডাক আসবে। যে-কোন মুহূর্তে।"

আরতির আর ও-কথা বলা হয় নি। প্রবীর নিজেই মুখর হয়ে উঠেছিল নিজের কথায়। একটা থেকে আর একটা প্রসঙ্গে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ এল আগস্ট আন্দোলনের কথায়। সে চোখে দেখেছে আন্দোলনের তীব্রতা। বোম্বাইয়ে যখন গুলি চলে, তখন সে বোম্বাইয়ে ছিল। গোটা বিহারের অবস্থা দেখে এসেছে। পাটনায় বেয়নেটের ডগা উঁচিয়ে বিশিষ্ট লোকদের দিয়ে রাস্তা কাটানোর, ভাঙা কালভার্ট মেরামত করানোর গল্প শুনে এসেছে।

কিছু ফটো তার কাছে ছিল। সেগুলিও দেখিয়েছিল। [illegible] গল্প, মেদিনীপুরের কাহিনী বলেছিল আরতি। মেদিনীপুর তখনও ইংরেজের হাতের অর্ধেক বাইরে। কোথাও বারোয়ারী পুজোর বাজনা বাজছিল। সেদিন ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ ঘুরছিল, রাত্রির অরণ্যে উল্লাসমত্ত দলবদ্ধ হাতির মত। আসামের জঙ্গলে একবার বাবার সঙ্গে বাবার এক ফরেস্টার বন্ধুর ব্যবস্থায় রাত্রে বন দেখেছিল। সেখানেই দেখেছিল দলবদ্ধ হাতিদের

মাতামাতি। ঠিক তেমনি। সীসের মত একটি একটানা মেঘের আস্তরণের উপর ছোট বড় খণ্ড খণ্ড মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার সঙ্গে দমকা বাতাস।

প্রবীরই এক সময় এ-সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে বলেছিল, "এ কি, সাইক্লোন নাকি?" এবং তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। বলেছিল, "কাল আসব।"

"এই দুর্যোগের মধ্যে যাবেন কী করে?"

"চলে যাব। কাছেই তো। আর তো শিবপুরে থাকছি না। এখন রয়েছি একটা হোটেলে। এই তো চৌরঙ্গীর মোড়ে।"

সপ্তমীর দিন বিকেল বেলা পর্যন্ত সাইক্লোন তার চেহারা নিয়ে দেখা দিল। হাতির দল যেন রাতারাতি পাগল হয়ে গেল। উন্মত্ত দাপাদাপিতে পৃথিবীকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

বাবা ভয়ার্ত স্বরে জড়িত জিহ্বায় বার বার তাকে ডাকছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, "এ কী? ওই?"

"ঝড়—বৃষ্টি!"

"এত? তার এত শব্দ?"

"বোধ হয় সাইক্লোন!"

"সাইক্লোন!" একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "পুরনো বাড়ি; পড়ে যাবে না তো?"

রোগের জন্য বাবা যেন দিন দিন অবোধ হয়ে যাচ্ছিলেন। কথা বলতে বলতে সেই সাহসী বুদ্ধিদীপ্ত অমৃত সেনের মুখে আতঙ্ক ফুটে

উঠেছিল। ছেলেকে বুঝিয়ে বলার মতই সে বলেছিল, "না। ছাদ তো নতুন। ছাদ তো ভেঙে করানো হয়েছে।"

"করানো হয়েছে?"

"হ্যাঁ। ওই তো ঢালাই ছাদ। দেখছেন না? কড়ি-বরগা নেই।"

"হ্যাঁ। কিন্তু—। ওঃ! কী ভীষণ ঝড়!"

একটু পরে বলেছিলেন, "সে। সে আসে নি?" প্রবীরের নাম মনে পড়ে নি তাঁর। মধ্যে মধ্যে তার নামও ভুলে যেতেন।

আরতি মনে করিয়ে দিয়েছিল, "প্রবীরবাবু? আসবেন কী করে? রাস্তায় যে জল জমে গেছে। আর যে দমকা ঝড় আর বৃষ্টি!"

অনুমান করে ঘাড় নেড়েছিলেন, "হ্যাঁ। হ্যাঁ।"

প্রবীর কিন্তু তার মধ্যেই এসেছিল। এসেছিল কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে। কিছু ডিম, একখানা বড় রুটি, এক টিন মাখন, আর তার সঙ্গে কিছু সোনামুগের ডাল নিয়ে। হেসে বলেছিল, "যা গতিক—তাতে বাজার করাতে পেরেছেন কিনা জানি না। কালও পারবেন কিনা বুঝতে পারছি না। তাই নিয়ে এলাম। এত বড় হগ-মার্কেট প্রায় জনশূন্য। এ ছাড়া কিছু পাই নি। সোনামুগের ডালটা হঠাৎ পেলাম। সাইক্লোনই হোক, হ্যারিকেনই হোক, খিচুড়ি খাবার বড় ভালো রাত—মানে আবহাওয়া এনেছে। ইলিশ পেলে সোনায় সোহাগা হত। তবুও ডিম খারাপ লাগবে না। যদি তাড়াতাড়ি বানানো সম্ভবপর হয়, আমিও খেয়ে যেতে পারি।"

"কিন্তু জলে ভিজে যে সপসপ করছেন।"

"রাস্তায় প্রায় সাঁতার দিতে হয়েছে। নতুন ওয়াটারপ্রুফ, ক্যাপ, ছাতা, গামবুট,—রণসাজের, মানে বর্মের আর খুঁত রাখি নি, কিন্তু মিথ্যেই এরা ওয়াটার-বুলেটপ্রুফ বলে বিজ্ঞাপন দেয়, আসলে ছররা আটকায়, বুলেট আটকায় না। সত্যিই আপাদমস্তক ভিজে গেছি। গামছার মত কেউ যদি নিংড়ে দিতে পারে তো এক চৌবাচ্চা জল হবে।"

"ছেড়ে ফেলুন ওগুলো। বাবার কাপড়-চোপড় দিচ্ছি আমি।"

"আগে এগুলো ধরুন। এর এক কণা কি দানা নষ্ট হলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না।"

হেসে ফেলেছিল আরতি, "এত খিচুড়ি খাবার লোভ? আপনাকে তো এমন ভোজন-রসিক বলে কোনদিন বুঝতে পারি নি।"

"ঠিক দিনটি না এলে বিশেষ রূপ প্রকাশ পায় কী করে বলুন? আমাদের জাতের এই বিক্রম, এই বুলেটের সামনে বুক পেতে দাঁড়ানো, এ রূপ কি এই বিয়াল্লিশের আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর না এলে প্রকাশ পেত কোনদিন? এই সময়ের আগে সুভাষবাবুর যত বড় এ্যাডমায়ারার হোক—কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল যে, হিটলারের পাশে মিলিটারী জেনারেলের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে তিনি আর্মির স্যালুট নিতে পারেন! তিনি নিজে ভেবেছিলেন?" কথাটা হেসেই সে শুরু করেছিল, কিন্তু বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সুন্দর মুখে যেন রক্তের উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছিল।

আরতিও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে অন্য কারণে।

হিটলারের, জার্মানির নাম সে সহ্য করতে পারে না। তার দাদাকে তারা—

বলেও ছিল, "ওদের নাম আমার কাছে করবেন না। আমি সহ্য করতে পারি না। আমি রাজনীতি থেকে অত্যন্ত দূরে থাকি কিন্তু সুভাষবাবুকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করতাম। তিনি শেষে—একটা দৈত্যের সঙ্গে—"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে চলে এসেছিল। বলেছিল, "কাপড় দিই দাঁড়ান। ওয়াটারপ্রুফট্রাঙ্কগুলো খুলুন।"

রাত্রে খিচুড়ি খেয়ে সে-রাত্রে প্রবীর আর হোটেলে ফেরে নি। রাত্রিটা তার বাবার পাশে বসে ছিল। রাত্রে তখন সাইক্লোন বোধ করি প্রচণ্ডতম গতিবেগে প্রকট হয়েছে। নিরাপদ ঘরে বসেও মনে হচ্ছে এই দুর্যোগ-রাত্রির বুঝি অবসান হবে না। প্রতি মুহূর্তে একটা ভীষণতম বিপদ যেন আসন্ন মনে হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছিল, গোটা বাড়িটাই বুঝি ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

এমনি একটা মুহূর্ত এসেছিল তাদের খাবার সময়। ও-ঘর থেকে তার বাবা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলেন, বোধ করি কারও বাড়ির টিনের একটা চাল উড়ে এসে তাদের ছাদের উপর বিপুল শব্দে আছাড় খেয়ে পড়েছিল।

খাওয়া ছেড়ে তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়েছিল প্রবীর। প্রবীরের সাহসেই সে সাহস পেয়েছিল, নইলে সেও ওই শব্দে হয়তো চিৎকার করে উঠত, নয়তো আড়ষ্ট পঙ্গু হয়ে যেত। বাবার কী হত সে

বলতে পারে না। সে যখন উঠে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন বাবার পুরনো খানসামা রামধারী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবীর তাঁর কপালে হাত দিয়ে মুখের উপর ঝুঁকে বলছে, "ভয় নেই। কিছু হয় নি। আমাদের বাড়ি ঠিক আছে। ভয় পাবেন না। বোধ হয় কোন টিনের চাল উড়ে আমাদের ছাদে পড়েছে।"

বাবা কথঞ্চিৎ সুস্থ হলে বলেছিল, "আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি আপনাকে বলছি, এ-বাড়ি এমন সাইক্লোন পর পর ছ-সাতদিন হলেও দাঁড়িয়ে থাকবে।"

বাবা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। প্রবীর বলেছিল, "কোন ভয় করবেন না। আমি রইলাম আপনার পাশে। আর কয়েক ঘণ্টা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাস্ করে যাবে।"

এর পর সে কাপড় দিয়ে দরজা-জানালার ফাঁকগুলি সযত্নে বন্ধ করে বলেছিল, "যতটা পারি সাউণ্ড-প্রুফ করলাম। এই ভয় করেই আমি এসেছি। আলিপুরের আবহাওয়া আপিসের এক বন্ধুর কাছে খবর পেলাম এত বড় সাইক্লোন একশো বছরের মধ্যে হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কথা মনে হল। ওঁর এই ছেলেমানুষের মত ভয় পাওয়ার কথা জানি। তাই এলাম। একলা আপনি সামলাতে পারবেন না। যান, আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন, শেষ রাত্রির দিকে ঝড় একটু কমবে বলে মনে করছি; তখন আপনাকে জাগিয়ে দেব।"

"না। আমিও থাকব।"

"না। থাকবেন না। না-হলে এই ঝড় মাথায় করে ভিজতে ভিজতে আমার আসার কোন অর্থ হয় না মিস্ সেন।"

এই সুরের এই কথাকে অমান্য করতে পারে নি আরতি। কিন্তু ঘুমুতেও পারে নি। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব, ছাদের উপর আছড়ে-পড়ে-যাওয়া টিনের চালে বৃষ্টিপাতের বিচিত্র শব্দ, ও-ঘরে বাবার জন্য চিন্তা, তার সঙ্গে তার বাবার পাশে প্রবীর জেগে বসে আছে, এই অস্বস্তিতে ঘুম তার আসে নি। প্রবীরের কত দান তাকে নিতে হবে ? কেন নেবে ? এই প্রশ্নে সে ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছিল। এ-ক্ষোভ তার এই প্রথম। এতদিন এ ক্ষোভ জাগে নি কেন, হঠাৎ এই কথাটা মনে হয়ে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল।

রাত্রি সাড়ে বারোটা বা একটার পর সে আর থাকতে পারে নি। বাবার ঘরে এসে ঢুকেছিল। একটু আশ্চর্য হয়েছিল। এ-ঘরে ঝড়ের শব্দ কম। ঘরটার উপরে ছাদে একখানা ঘর আছে, সেই কারণে টিনের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দটাও কম। বরং যেন একটি সুরময় শব্দের মত হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার মানুষ; যতটা পেরেছে, শব্দের প্রবেশ বন্ধ করেছে। বাবা গাঢ়-ঘুমে ঘুমুচ্ছেন। নাক ডাকছে। প্রবীরও চেয়ারের মাথায় হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। চেয়ারখানা আরামপ্রদ। ইজিচেয়ারেরই অভিনব সংস্করণ। ঘুমুতে অসুবিধে হয় না। কোণে ঠেস দিয়ে রামধারী ঘুমুচ্ছে। আরতি কাউকে না জাগিয়ে এ-পাশের চেয়ারখানায় বসে গেল। নীল আলোয় ভরা ঘরখানা যেন স্বপ্নাবেশে ভরে গিয়েছিল। তার মধ্যে স্বাস্থ্যে দীপ্তিতে পরিপূর্ণ ঘুমন্ত প্রবীরকে অপরূপ বলে মনে হচ্ছিল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে জল এসেছিল তার। কেন সে তা জানে, কিন্তু সে থাক। তারপর কখন সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল ঘড়ি বাজার শব্দে। ঢং ঢং ঢং শব্দে চোখ মেলেছিল সে। চোখ মেলেই আবার সে চোখ বন্ধ করেছিল অবশের মত। প্রবীর চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। ঘুমের ভান করে সে পড়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ মেলেছিল? প্রবীর কি এখনও দেখছে? হ্যাঁ দেখছিল। কিন্তু এরপর আর চোখ বোজা যায় নি। চোখে চোখ রেখেই জিজ্ঞাসা করেছিল, "কটা বাজল?"

"চারটে দশ মিনিট।"

প্রবীর অন্তত দশ মিনিট তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সকালেও ঝড় ছিল প্রবল, তবে কমে এসেছে। প্রবীর বিদায় নিয়ে বলেছিল; "ও-বেলা পারলে আসব। ঝড় ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই কমবে। আচ্ছা—।"

আরতি বলেছিল, "ধন্য মানুষ কিন্তু। চিরকাল আমরাই ঋণী থাকলাম।"

"কী আশ্চর্য! একে আপনি ঋণ বলেন? আপনাদের আত্মীয়ের মত মনে করি—ভালবাসি—"

"তা হলে আজও 'আপনি' সম্বোধনটা কায়েমি হয়ে থাকত না।"

"সেটা উভয়ত।"

"না। আজ আমি একবারও 'আপনি' বলি নি।"

"ওঃ। আশ্চর্যভাবে ঠকিয়েছ কিন্তু। আমি লক্ষ্যই করি নি। আমারও অনেকবার কিন্তু মনে হয়েছে।"

"হয় নি। কখনও না। বিশ্বাস করব না আমি।"

"অন্তত কাল বলব বলে এসেছিলাম, এটা বিশ্বাস কর।"

"বললে না কেন?"

"জানি না। বোধ হয় ঝড়ের বেগ, তোমার বাবার আতঙ্ক, এই সবে একটা গোলমাল করে দিল।"

"অথচ তোমারই এটা বলা উচিত ছিল। তুমি দাতা—আমরা গ্রহীতা।"

হেসে প্রবীর বলেছিল, "দাতার চেয়ে গ্রহীতা সব ক্ষেত্রে ছোট নয় আরতি। যে গ্রহীতা অসংকোচে মর্যাদার সঙ্গে মাথা তুলে নিতে পারে, সে তো দাতার চেয়েও বড়।"

"তাই কেউ পারে নাকি?"

"পারে বৈ কি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দান যে-ভিক্ষুক অসংকোচে গ্রহণ করে, সে হল পরম গ্রহীতা—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট।"

"বাবাঃ, কী থেকে কী। যাও, খুব হয়েছে।"

"আরও নিতে পার।"

"আর আমি শুনতে চাই না।"

"সেটা তত্ত্বকথা নয়।" তারপর স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল সে। বলেছিল, "ভালবাসা যেখানে অকৃত্রিম, অকপট, সেখানে যে ভালবাসে সে দিতেও পারে, আর নিতেও পারে। হিসেব করে না। নারী পারে পুরুষের কাছে নিতে, পুরুষও পারে নারীর কাছে নিতে। ও-প্রাপ্যের পরিমাণও নেই—যত দেবে নেবে।"

তার ইচ্ছা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে দাঁড়াতে এবং

বলতে, "দাও না। এইবার দাও!" কিন্তু তা পারে নি। আটকে গিয়েছিল কথাটা।

প্রবীর বলেছিল, "চুপ করে রইলে যে!"

এবার সে বলেছিল, "ভাবছি, পাতব হাত?"

"সে ভাল কথা। আমি ততদিন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি। আমিও কাল থেকে বলব বলব করে বলতে পারি নি। কালই আমার পরওয়ানা এসে গেছে। আজ রাত্রেই পাড়ি। উপস্থিত পুনা।"

পাথর হয়ে গিয়েছিল আরতি।

"আমি তোমাদের ভালবেসে আপনার ভেবে সামান্য কিছু করলাম। আনন্দ পেলাম, ভালো লাগল বলে করলাম। ও নিয়ে হিসেব কোর না। ঋণ ভেবো না। কেমন?"

হাসতে হাসতে সে চলে গিয়েছিল। অপেক্ষা করে নি। যেন ও-বেলা ফিরে আসবে।

এরপর আর একদিন দেখা হয়েছিল। সে অনেকদিন অর্থাৎ কয়েক মাস পর। তার আগে বিয়াল্লিশের চব্বিশে ডিসেম্বর বাবা এয়ার-রেডের সেই আতঙ্কময় দুঃসময়ে মারা গেলেন।

বাবা সেদিন একবার প্রবীরকে খুঁজেছিলেন—বলেছিলেন, "সে কই?"

ওঃ, সে কী রাত্রি। ওঃ, আতঙ্কিত মানুষের ঘরে ঘরে সে কী আর্তনাদ। চন্দ্রালোকিত রাত্রি এত ভয়ঙ্কর হতে পারে, এ তার ধারণা ছিল না।

তারও সে-রাত্রে বার বার মনে হয়েছিল প্রবীরকে। ভয়ের মধ্যে বিপদের মধ্যে তাকেই মনে পড়েছিল দুজনেরই। হয়তো বাবার মনে আরও কিছু ছিল। ওদিকে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ হয়ে চলেছিল। একটা প্রচণ্ড শব্দের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বাবা 'আঁ—' চিৎকার করে উঠে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

ওঃ!

বাকী রাত্রিটা শবদেহ আগলে বসে ছিল সে। মনে মনে আরতি প্রবীরকেই ডেকেছিল। কিন্তু সে তখন দূরে—ট্রেনিং ক্যাম্পে। অল ক্লিয়ারের পর খবর দিয়েছিল সুধা-বউদির বাপের বাড়িতে।

মামারা ছিলেন না। রেঙ্গুন পড়ার কিছুদিন পর থেকেই তাঁরা দেওঘরে চলে গিয়েছিলেন। মামাতো ভাইরা আসা-যাওয়া করত; ব্যবসার জন্যও বটে, এবং কলকাতার নৈশ আনন্দের জন্যও বটে। কিন্তু তার কোন খোঁজ-খবর করত না। তাই তাদের খবরও সে দেয় নি। কলকাতায় তখন পূর্বরণাঙ্গনের সৈনিকদের কল্যাণে নৈশ আনন্দের রঙ্গমঞ্চে নতুন যবনিকা উঠেছে। নোট উড়ছে বাতাসে। মাসাজ হোম, হোটেল এবং আরও কত বিচিত্র ব্যবস্থায় গৃহস্থকন্যারাও সন্ধ্যাচারিণী হয়ে উঠেছে। তাদের ব্লাউসের ভিতর থেকে একশো টাকার নোট বের হতে শুরু হয়েছে। কালোবাজারের অদৃশ্য লেন-দেনের কল্যাণে মুদী লক্ষপতি হচ্ছে। লক্ষপতি কোটিপতি হচ্ছে। অন্যদিকে ফুটপাথে কঙ্কালের সারি। গৃহস্থ-পাড়ায় রাত্রে কান্না ভেসে বেড়ায়, 'একটু ফ্যান!' 'এক মুঠো এঁটোকাঁটা!'

সেদিন খবর পেয়ে এল সুধা বউদির ভাই এবং ভাইপো। ভাইপো অরুণ। অরুণ আশ্চর্য কার্যক্ষম ছেলে। আগে থেকেই সে চিনত। ইউনিভারসিটি ছেড়ে রাজনৈতিক কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে। সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা অরুণই করেছিল। লোকজন সংগ্রহ করা থেকে সব কিছু। ফুল এনে শবের উপর ছড়িয়ে দিতে দিতে বলেছিল, "পৃথিবীতে এই বর্বর অত্যাচার যারা করছে তাদের যেন ভগবান ক্ষমা না-করেন।" এর পর হঠাৎ দু' লাইন রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে—'

আবৃত্তি করে বলেছিল।—মানুষ কখনও এ ক্ষমা করবে না। মানুষ প্রস্তুত হচ্ছে।

চোখ দুটো তার জ্বলে উঠেছিল। ওই জ্বলন্ত চোখের জ্বালা আরতির মনের শোকের বিষণ্ণ মেঘাচ্ছন্নতার বুকে একটা বিদ্যুৎশিখা জ্বালিয়ে তুলেছিল।

বাবার শ্রাদ্ধের ব্যাপারেও অরুণই তার সব করে দিয়েছিল। আরতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল—কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা অরুণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, "এ সব কি বলছেন। আপনার বাবা এবং আমার দাদু যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সুধা পিসিমাও এমনি অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন—আমি তাঁকে কি লিখেছি জানেন? লিখেছি—'তাই তো পিসিমা, কথাটা তো তুমি ভাল মনে করে দিয়েছ'।"

শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়ার পরও অরুণ তার খোঁজ নিতে ভোলে নি। নিত্য খোঁজ নিয়েছে। একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে। এবং তাকে সে-ই জোর করে সঙ্গে নিয়ে বের করেছিল ঘর থেকে। বলেছিল, "ঘরে বসে তো জীবন কাটবে না মিস সেন। পয়সা থাকলেও না। জীবনের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে অন্ধকার গুহাতে বসে থাকলেও জীবনের যুদ্ধ সেখান পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। বের হ'ন। কাজ করুন।"

"কাজ? কি কাজ?"

"কাজের অভাব আছে? মানুষের সেবা করুন। কত কাজ!"

ভাল লেগেছিল অরুণের কথা।

অদ্ভুত ছেলে। প্রবীরের অভাব সে পূর্ণ না করুক—অনুভব করে হতাশায় ভেঙে পড়তে দেয় নি। তাকে নূতন দিকে নূতন কাজে লাগিয়েছিল। নানান সমিতির কাজ। তার বাড়িটাকেই এ পাড়ার আপিস করে তুলেছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্য, মহিলা-রক্ষা সভা, আরও অনেক অনেক কিছু। তার অনেক কিছু মত্ততা। তার বিচার নতুন, দৃষ্টি নতুন। একক এবং ভাগ্যহত জীবনে তা সেদিন ভাল লেগেছিল আরতির। ক্রমে ক্রমে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল কাজের মধ্যে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন এসেছিল প্রবীর। একেবারে মিলিটারী পোশাকে এবং ভঙ্গিতে। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি! মুখে-চোখে, ভাবে-ভঙ্গিতে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন। উচ্চকণ্ঠে ডেকে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকেছিল, "আরতি! আরতি!"

এসে ঘরের মধ্যে মজলিস দেখে মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল।

"প্রবীর!"

"হ্যাঁ। কিন্তু—"

"এঁরা সব আমাদের সমিতির কর্মী। দেশের এই দুঃসময়ে আমাদের অনেক কাজ। সেই কাজের জন্য সমিতি করেছি।"

"ও। কিন্তু—বাবা—?" শূন্য ঘরটার দিকে সে তাকিয়েছিল।

"বাবা নেই। ২৪শের এয়ার রেডের আতঙ্কে তিনি হার্টফেল করে মারা গেলেন।"

"বাবা নেই!"

"তিনি মুক্তি পেয়েছেন হয়তো। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করে এই কাজ নিয়েছে। আর কি করতে পারি বল? আমার বিশ্বাস বাবার আত্মা, দাদার আত্মা এতেই সান্ত্বনা পাবেন।"

প্রবীর একটা আসনে বসে একটু বিষণ্ণ হেসেছিল। কিছুক্ষণ পর বন্ধু-বান্ধবীরা চলে গেলে সে আর প্রবীর যখন দুজনে রইল তখন সে হেসেছিল, উৎফুল্ল হতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রবীর হয় নি। চা খেয়েছিল নিঃশব্দে। কথা বললেও ভাল করে উত্তর দেয় নি। কিছুক্ষণ পর বলেছিল, "বিদায়। যদি ফিরি তো আবার দেখা হবে। কালই চলেছি। নিরুদ্দেশ যাত্রা। মানে ঠিক কোথায় যাচ্ছি জানি না। ভোর রাত্রে মিলিটারী স্পেশাল ছাড়বে। এসেছি আজ সকালে। দেখা করে গেলাম।"

সে তার হাত চেপে ধরেছিল।

প্রবীর বলেছিল, "ছাড়!"

সেই শেষ দেখা। শুধু একখানা মাত্র চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, 'আরতি, সেদিন তোমার কাছে শুধু বিদায় নিতেই যাই নি, জীবনে তোমাকে বাঁধতেও গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বলব, রতি, বিদায়ের দিনে বাসর সাজিয়ে আমাদের জীবনের দেওয়া-নেওয়াটা সেরে নিয়ে যাই। যেটা সারা হলে মৃত্যুর মধ্যে হারিয়েও আমরা কেউ কারুর কাছ থেকে হারাব না। কিন্তু পারলাম না। তোমার বন্ধু-বান্ধবীদের দেখে উৎসাহটা এমন ধাক্কা খেল যে—আমার সব কল্পনা একটা ভেঁলার মত চোরা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফেঁসে গেল। আমার ভালো লাগল না বলব না, বলব আমার উৎসাহটা চলে গেল তাই খানিকটা নীরবে বসে থেকে ফিরে এলাম। পরে ভেবেছি, ভালই হয়েছে। তোমার জীবনকে টেনে নিয়ে আমার এ অনিশ্চিত জীবনে একদিনের জন্য জড়িয়ে কি হত? তুমি সুখী হও।'

এর পর খানিকটা যুদ্ধের সেন্সের-বিভাগ থেকে কাটা।

চিঠি পড়ে কয়েক ফোঁটা জল তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল।

তারপরই তার কপালে ভ্রূকুটি রেখা জেগে উঠেছিল। মনে তার প্রশ্ন জেগেছিল তার বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে কি সে দেখেছিল যা তার ভাল লাগে নি?

সেই মুহূর্তে সে বসেছিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। নিজের প্রতিবিম্বের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে।—কি দেখলে খুশী হত প্রবীর? চুল এলো করে বিছানায় শুয়ে বাবা এবং দাদার জন্য কাঁদা আর তাকে মনে-মনে ডাকা—'তুমি এস প্রবীর, আমি আর পারছি নে?'

মনে পড়ছে অরুণ এসেছিল সেই সময়। এসেছিল দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ নিয়ে এক তরুণ লেখকের লেখা একখানা নাটকের অভিনয় করবার কথা নিয়ে। তাকে একটা পার্ট নেবার কথা বলতে এসেছিল।

নাটকে পার্ট ? না। অন্য সব কাজ সে করবে, ঘুরে টিকিট বিক্রী ; অন্য কাজকর্ম ক'রে দেওয়া সব করবে কিন্তু নাটকে অভিনয় সে করতে পারবে না।

এই তার শেষ চিঠি। এরপর আর কোন খবর সে কোনদিন পায় নি। জীবনে সে তখন কাজ নিয়ে মেতে আছে। মনের মধ্যে সুখ ছিল যে, দুঃস্থ আর্ত মানুষের সেবা করছে, তার ক্ষুব্ধ আক্রোশের তৃপ্তি ছিল যে, যাদের বর্বরতায় তার দাদা মরেছেন বাবা মরেছেন—তাদের বিরোধিতা করছে সে। দিন-রাত্রি সে ঘুরছে, এ পাড়া-ও পাড়া। বিশ্রাম চাইলেও বিশ্রাম পায় নি। অরুণ তাকে টেনে নিয়ে গেছে। এদিক দিয়ে অরুণ ছিল তার চেয়েও প্রমত্ত। কিন্তু আশ্চর্য, অরুণের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়াবার কথা কোনদিন তার মনে হয় নি। লোকে কানাকানি করেছে সে ব্যঙ্গ হাসি হেসেছে। তারই মধ্যে হঠাৎ এক একদিন প্রবীরকে সে স্বপ্ন দেখেছ। জেগে উঠে বাকী রাত্রিটা তার কথাই ভেবেছে। কোনদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে কোনদিন চোখের কোণ থেকে দুটি জলের ধারা গড়িয়ে এসেছে। একদিন সারারাত্রি অঝোর ঝরে সে কেঁদেছিল। তার আগের দিন অরুণের সঙ্গে ওদের দলের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। সেদিন শুধুই প্রশ্ন করেছিল—প্রবীর

হারিয়ে গেল? কেন···তুমি যুদ্ধে গেলে? পরের দিন চিঠি লিখেছিল প্রবীরের দাদাকে দিল্লীতে। তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন তার কোন খবর তাঁরা পান নি। যুদ্ধ বিভাগ থেকে জানিয়েছে উদ্দেশ নেই।

হারিয়ে গিয়েছিল প্রবীর। জীবনের আকাশে একটা নবাগত তারার মত ক'দিনের জন্য উদয় দিগন্তে উঠে আবার মিলিয়ে গেল—সেই অন্ধকারের মধ্যে,—যে অন্ধকার আদিতে এবং অন্তে অমাবস্যার উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণ-সমুদ্রের মত চিরকাল নিঃশব্দে কল্লোলিত হচ্ছে।

সেখানে ডুবলে তো আর ওঠে না। কিন্তু এই দাঙ্গার দুর্যোগের মধ্যে তার চোখের কাছে এগিয়ে এল এই কৃষ্ণ-সমুদ্র এবং সেই সমুদ্র থেকে উঠে এ কি কালো চেহারা নিয়ে প্রবীর তার সামনে দাঁড়াল?

অথচ সে তাকে চিনতেও পারলে না?

॥ ছয় ॥

এই চিন্তার মধ্যেই আরতি ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন। কখন অর্থে ছুটার পর। ঘড়িতে ছুটো বাজা তার মনে আছে। তার আগে ঘণ্টা-খানেক আধো ঘুমের মধ্যে নানান এলোমেলো স্বপ্ন। দাঙ্গার কলকাতার চীৎকার তারই মধ্যে কানে এসে ঢুকেছে। সেই সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছে প্রবীর ড্রাইভারের পোশাক ছেড়ে মিলিটারি পোশাক পরে হাতে রাইফেল নিয়ে মিলিটারি ট্রাকে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকটা ছুটছে। তাদের কপালিটোলার বাড়ির সামনে হাতে রাইফেলটা কাঁধে লাগিয়ে গুলি ছুঁড়ছে। একবার দেখলে অরুণের জামার কলার ধ'রে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে টেনে তুলছে ট্রাকের উপর। এমনি সব স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল গাঢ় নিদ্রায় অল্প কিছুক্ষণের জন্যে।

সকাল বেলা ঘুম ভেঙেও সে কয়েক মিনিট অভিভূত হয়ে রইল। মামার বাড়ির যে ঘরখানায় সে শুয়েছিল সে ঘরখানাকে ঠাওর করতে কিছুক্ষণ লাগল। তারপর সে উঠে বসল। মাথার ভিতরটা নিদ্রাহীনতার অবসাদে ঝিম-ঝিম করছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে।

বুকের ভিতরটায় একটা অপরিসীম উৎকণ্ঠা। একটা উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের সম্মুখে নিরুত্তর পৃথিবী হতাশায় ভরে উঠেছে। ওকে প্রবীর বলে স্বীকার করতে পারছে না প্রবীর নয় বলে অস্বীকারও করতে পারছে না। এই অবস্থার মধ্যে জীবন বিস্বাদ, পৃথিবী তিক্ত।

বারবার এক দুঃসহ বিরক্তি বোধে আঃ—আঃ বলে চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করছে। একটা মাছি কি একটা মশা কি জানালার সামান্য ছিদ্র বেয়ে একটি রৌদ্রচ্ছটা কি কাপড়ে একটা কাঁটার খোঁচা, কিছু একটা উপলক্ষ্য পেলে সে এই বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বেঁচে যায়।

বাড়ির সকলে উঠেছে। পায়ের শব্দ, কথার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ তার দোরে কেউ বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিয়ে তাকে ডাকলে। কিন্তু তার সাড়া দিতে ইচ্ছে হ'ল না। সে উঠে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। মুখ-হাত ধুয়ে মাথাটা পেতে দিলে কলের তলায়। ঠাণ্ডাজল বড় ভাল লাগল। ক্লান্তি যেন ধুয়ে যাচ্ছে। একেবারে স্নান সেরে নিতে ইচ্ছে হল তার। এ সবের মধ্যেও কিন্তু প্রবীরের প্রশ্ন স্থির হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে যেন মাথা ঠেলে সব সরিয়ে দিয়ে মুখো মুখি দাঁড়াচ্ছে। হঠাৎ মনে হল শেল-শক নয় তো? শেল-শকে মানুষের স্মৃতি হারিয়ে যাওয়ার কথা তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুনে আসছে, পড়ে আসছে। এই ভাবনার মধ্যে সে যেন একটা মীমাংসা পেলে। হ্যাঁ তাই হবে। নিশ্চয় তাই। সকল অতীতকে সে ভুলে গেছে।

মনে মনেই সে প্রবীরের সঙ্গে কথা বললে, কল্পনায় ড্রাইভার-টিকে সামনে দাঁড় করিয়ে ডাকলে, "প্রবীরবাবু!"

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার দিকে তাকিয়ে সে বললে, "আমাকে বলছেন? কিন্তু প্রবীর কে? আমি-তো—আমি-তো—!"

"আমাকে চিনতে পারেন না?"

"আপনাকে? না-তো! না-না। মনে হচ্ছে দেখছি—। কিন্তু। উঁহু। মনে পড়ছে না।"

ভাবতে গিয়ে কাঁদতে লাগল আরতি। কিন্তু কাঁদবারও সুযোগ নেই। অবসর নেই,—বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ছে। বোধ হয় সুধা বউদি। বাথরুম থেকেই সে সাড়া দিলে, "যাচ্ছি। একটু অপেক্ষা কর বউদি।"

স্নান সেরে কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে এল সে।

সুধা বউদি নয়,—দরজায় দাঁড়িয়ে বড় মামাতো ভাই পাতুদা।

মুহূর্তে দেহ-মনে সে আড়ষ্ট এবং শক্ত হয়ে উঠল। মনে হল কেন সে এ বাড়িতে এসেছে? কেন সে অরুণদের বাড়ি গেল না? না। অরুণদের বাড়িও নয়—কেন সে কাল ফিরে যায় নি—শম্ভুবাবুদের সঙ্গে।

পাতু আজ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। বললে, "যাক্ প্রাণে বেঁচেছিস এই ঢের! এখন একবার নিচে আসতে হবে তোকে।"

নিরুত্তর হয়েই দাঁড়িয়ে রইল আরতি।

পাতুই বললে, "একটা স্টেটমেণ্ট দিতে হবে।"

"স্টেটমেণ্ট! কিসের স্টেটমেণ্ট?"

"এই কপালিটোলার বাড়িতে কি অত্যাচার হয়েছে এই সব আর কি। লীডাররা এসে সব বসে আছেন। আমি খবর দিয়েছিলাম কাল রাত্রে।"

আরতি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। কি স্টেটমেণ্ট সে দেবে? সেই নিষ্ঠুর অত্যাচার, মানুষের সেই বীভৎস পাশবিকতার নগ্ন প্রকাশ মনে পড়ে সে শিউরে উঠল! কপালিটোলার বাড়ি থেকে বাগবাজার নিকিরিপাড়ার পোড়া বস্তী—রাস্তার ধারে ফুলে-ওঠা সেই ছেলেটার শব—শোভাবাজারের বস্তীর কথা মনে পড়ছে। এক সম্প্রদায় পাশবিক আক্রোশে অপর এক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করতেই—তারও পাশবিক সত্তা বেরিয়ে এসেছে মনের গুহা থেকে! দুটোতে কামড়া-কামড়ি করছে। অবশ্য হয়তো আক্রান্তের অন্য উপায় ছিল না আত্মরক্ষার! কিন্তু কি বীভৎস! কি ভয়ঙ্কর!

পাতুদা বললে, "বুঝতে পারছি মুখে সে বলতে পারাও যায় না! তা আমি একটা স্টেটমেণ্ট আন্দাজ করে লিখে এনেছি। কাল তোর বউদির কাছে তো সব শুনেছি! এইটে তুই সই করে দে।"

ঠিক এই মুহূর্তে এসে পড়লেন সুধা বউদি। নিচের তলা থেকেই তিনি উঠে এলেন—কপালে সারি সারি কুঞ্চন-রেখা। সিঁড়ির চাতাল থেকেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি ওটা? ওই কাগজটা!"

পাতুদা সুধা বউদিকে ভয় করে। সুধা বউদির এক আশ্চর্য সহ্যশক্তি আছে যে সহ্যশক্তিতে সে স্বামীর সকল জীবন ভ্রস্টতাকে ক্ষমা করে, নিজের জন্য কিছু দাবী না-করেই স্বামীর প্রতি এবং এই সংসারের প্রতি তার কর্তব্যগুলি নিখুঁত ভাবে নিঃশব্দে ক'রে যায়। সেই আশ্চর্য শক্তিকে পাতুদার ভয় না-করে উপায় নেই। শ্বশুর থেকে চাকরটি পর্যন্ত এই মেয়েটির সেবায় স্নেহে পরিতৃপ্ত; তার গাম্ভীর্যের কাছে তারা অবনত। সুধা বউদি

মনের ওজনে যেন বড় ভারী। এ সংসারের তৌলদাঁড়িতে তিনি যে দিকে চেপে বসে আছেন সে দিকটাই মাটিতে ঠেকে চেপে স্থির হয়ে রয়েছে, বাকী দিকটায় গোটা সংসারটাই যেন লঘু হয়ে শূন্যে ঝোলে এবং দোলে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর শয্যা আলাদা শুধু তাই নয়—পাতুদা স্নান না-করা পর্যন্ত তিনি তাঁকে ছুঁতে চান না। কোন দিন বেশী মদ খেয়ে অসুস্থ হ'য়ে বাড়ি ফিরলে, তাঁকে শুইয়ে মাথা ধুইয়ে বাতাস দিয়ে সুস্থ করে নিজে স্নান ক'রে আপন শয্যায় শুয়ে পড়েন। এ মানুষকে ভয় না করে উপায় কি? সেই বউদি সিঁড়ির চাতাল থেকেই প্রশ্ন করে এসে যখন কাগজ খানা টেনে নিলেন স্বামীর হাত থেকে তখন পাতুদা নিরীহ ভাবে শুধু বললেন, "ওটা স্টেটমেণ্ট একটা। মানে—।"

সে ব্যাখ্যা করবার পূর্বেই সুধা বউদি চোখ বুলিয়ে—কাগজটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, "লজ্জাও নেই, পৃথিবীতে কারুর উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাসও নেই। নিজে হাতে তুমি এই সব লিখেছ?"

পাতু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললে, "কেন? কাল রাত্রে তুমি সব বললে না?

"কি বলেছি তোমাকে? আরতির এই দুর্ভাগ্য দুর্দশার কথা আমি বলেছি তোমাকে?"

"সেকথা মেয়ে ছেলেতে বলতে পারে না নিজের মুখে। ওটা অনুমান ক'রে নিতে হয়।"

"অনুমান করে নিতে হয়? অনুমানের মুখে ঝাঁটা!"

হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন সুধা বউদি, তারপর অত্যন্ত ঘৃণাভরে বললেন, "তাই বা কেন ? এ তোমার মত লোকের পক্ষেই সম্ভব। নিত্য রাত্রে যে-লোক ছুটোর সময় মদ খেয়ে টলতে-টলতে বাড়ি আসে তার পক্ষে এই অনুমানই তো স্বাভাবিক। তোমাদের যদি লুঠতরাজের সাহস থাকত—সুযোগ পেতে—তবে তোমরা যে কি করতে সে বোধ হয় ভগবানও অনুমান করতে পারেন না। ধর্ম-বিশ্বাসী সব ; ধর্মের জন্যে সমাজের জন্যে দরদ আজ উথলে উঠেছে। কি হচ্ছে নিচে ? কিসের জটলা সব ? শুনলাম একজন গলাবাজী করছেন দাঁতের জন্যে দাঁত নেব, চোখের জন্যে চোখ নেব ; একটার জায়গায় ছুটো নেব। এই তো কিছু দিন আগেও নেতাজীর ঝাণ্ডার তলায় হিন্দুমুসলমান এক হয়ে যাবে বলে চেঁচাতে। আজ উল্টো গাইছ।"

পাতুদা চীৎকার ক'রে উঠল, "সুধা! তোমার আস্পর্ধা বড় বেড়ে গেছে!"

সুধা বউদি বললেন, "আমার আস্পর্ধা চিরদিন। সে তো গোড়ায় মারপিট করেও দেখেছ ভাঙতে পার নি। এতদিন পর চীৎকার করে ধমক দিয়ে কি আর দমাতে পার ? কিন্তু তোমার এ আস্পর্ধা কেন বলতে পার ? আরতিকে অপমান করতে এসেছ ? যাও, নিচে যাও। সেখানে বসে বাঘ ভাল্লুক গণ্ডার যত পার মুখে মার, আমি চা খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি ওই নিচের যারা বসে গুলতানি করছে—তাদের সকলকেই চিনি—সব মুখে বাঘমারার দল। সকলকে অপমান করাই ওদের স্বভাব। কাল,

অমনি, আরতিকে যারা উদ্ধার করে পৌঁছে দিতে এসেছিল—লাটু কোথা তাদের ধন্যবাদ দেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তা—না,—তাদের অপমান করলে। আর হলও তেমনি ফল—লোকটা ড্রাইভার হলে কি হয়—এমন ধমক দিলে যে লাটু বাবু চমকে উঠলেন। যাও নিচে যাও। আয় আরতি!"

সুধা বউদি বাঁচিয়ে দিলেন তাকে। কিন্তু চোখের জল সে সম্বরণ করতে পারলে না। টপটপ করে চোখের জল ঝ'রে পড়ল এক মুহূর্তে। বউদি বললেন, "কাঁদিস নে। জীবনে এই বয়সে দুঃখ তো কম পাস নি, সহ্য তো অনেক করতে হয়েছে করেছিস। এটুকুও সহ্য কর। আমার দিকে তাকিয়ে দেখে কর। তোর তো ভাই রে। আমার? ভেবে দেখ!"

হাসলেন বউদি। সে হাসি আশ্চর্য, তারপর বললেন, "ঘেন্না। আয়!"

সারা সকালটাই সে প্রায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। দুটি ভিন্ন ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। একটি ওই ড্রাইভারটির—না, প্রবীরের; ও যে প্রবীর তাতে ওর আর সন্দেহ নেই। অন্য ভাবনা তার নিজের। আজ কোথায় গিয়ে অসঙ্কোচে স্বাধীনতার মধ্যে বাস করতে পারে। সেখানে থেকে সে প্রবীরের খোঁজ করতে পারবে; তার যে স্মৃতি হারিয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। নিজের ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করতে পারবে। কাল-যুদ্ধ; তার জীবনটাকে তছনছ করে দিয়ে গেল।

আজও তার জের মেটে নি। এই দুর্যোগ-এই গণ্ডগোলের মধ্যে কোথায় কোন্ চোরাবালি লুকানো আছে—কোথায় ধুলোর মধ্যে মেশানো আছে ফনিমনসার বিষাক্ত কাঁটা সে নির্ণয় করা তার পক্ষে যেন অসম্ভব মনে হচ্ছে। কোথায় ন্যায় কোথায় সত্য এ সে বুঝতে পারছে না। গত কয়েক বছর অরুণ তাকে টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল একটা প্রচণ্ড আবর্তের মধ্যে। তার গতি সামনের দিকে না থাক,আবর্তের ঘূর্ণিপাক ছিল এমনই প্রবল এবং প্রচণ্ড যে তার মধ্যে কোন দিন মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে ভাববার অবকাশ পায় নি। আজ যেন সে আবর্তটাও চারিপাশে এবং তলদেশের গভীরে এক কঠিন পাথরের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গতি হারাচ্ছে, আবর্তের পাক মন্দীভূত হয়ে আসছে। ওই আবর্তের কেন্দ্রের সঙ্গে তার সংস্পর্শ কোন দিন ঘটে নি ; সে এমন কোন কাজ করে নি যার জন্য তাকে লজ্জিত হতে হয় ; সে সেবা কাজ নিয়ে ছিল, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ; অবশ্য অরুণ তাকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু সে তার হাত ছাড়িয়ে সরে এসেছে ; তার সঙ্গে বারবার তার বিরোধ হয়েছে। প্রতিবারই অবশ্য মিটেছে কিন্তু তারই মধ্যে সে স্পষ্ট বুঝেছে অরুণ তাকে জীবনে ঠিক চাচ্ছে না —চাচ্ছে তাকে দলের মধ্যে। অরুণ কপট নয়—এই ক'বছরে সে নিজের সংসারে—সংসারের বাইরে সমাজে সর্বসমক্ষে অকপট স্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। বাড়ির সঙ্গে দলের মতের বিরোধ —সে বাড়ি ছেড়েছে, একলা একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। সংসারের জন্য মমতাও সে বোধ করে না। এতদূর পর্যন্ত তার

সঙ্গে বিরোধ সত্বেও সে তার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু একদিন তার মোহ নিদারুণ ভয়ে পরিণত হল, সে দিনের কথা সে কোনদিন ভুলবে না। অরুণ সেদিন তাকে তিরস্কার করতে এসেছিল, অরুণদের বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। যোগাযোগ অন্য কিছু নয়—১৯৪২ সালের আন্দোলনে যারা জেল গিয়েছিলেন —তাদেরই কয়েকজন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসে একটি বিশেষ নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ করছিলেন; উদ্যোক্তাদের প্রধান ছিলেন শচীন মিত্র। ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের অবিসম্বাদী নেতা। তখন অরুণদের সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ ছিল না। বিয়াল্লিশ সাল থেকে এই মত-বিরোধ প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। শচীনবাবু তার কাছে এসেছিলেন—এই নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ নিয়ে। সে সম্মতি দেয় নি কিন্তু অসম্মতি জানিয়ে ফিরিয়ে দেয় নি, বলেছিল—ভেবে দেখব। বিচিত্র ঘটনা, ঠিক ঘণ্টাখানেক পরে অরুণ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল রুদ্র-মূর্তিতে।—"তুমি ওদের সঙ্গে অভিনয় করতে যাচ্ছ?"

তার সে ভঙ্গি দেখে সেদিন এক মুহূর্তে তার চিত্ত তিক্ততায় ভরে উঠেছিল। বলেছিল, "তুমি শচীনবাবুদের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। আর কাদের কথা বলব?"

"যদি যাই তাতে দোষ কি?"

"দোষ কি?"

"হ্যাঁ দোষ কি?"

"তোমার সঙ্গে আমাদের তাহলে কোন সম্পর্ক থাকবে না।

তারপরই বলেছিল, "তোমার মত অপরচুনিস্টি—কেরিয়ারিস্ট তাদের ধারাই এই।" অকস্মাৎ উগ্রতর হয়ে বলেছিল, "তোমাদের সমস্ত ফ্যামিলিটাই যে তাই। মামা, মামাতো-ভাইরা, তোমার বাবাও ছিলেন তাই।"

সে চীৎকার করে উঠেছিল, "অরুণ!"

অরুণ তবু থামে নি—সে বলেই চলেছিল, "তোমাকে চিনত কে? একটা পচা ঘরের বিলাসী মেয়ে; কলেজের ছেলেরা নাম নিয়ে কুৎসিত হাসি তামাসা করত; অধ্যাপকেরা মুখমিচ্‌কে হাসতেন;—"

সে আবার চীৎকার করে উঠেছিল, "অরুণ!"

অরুণ তবু থামে নি, "সুব্রত একটা গুণ্ডা সে তোমাকে অপমান করেছিল; সমস্ত জেনেও I took pity on you—I gave you a chance—"

এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "এটা আমার বাড়ি অরুণ!"

"আমাকে বের ক'রে দিতে চাও?"

"বলতে চাই আমারও সহ্যের একটা সীমা আছে। আমি গৃহস্থ বলে আমি আগন্তুকের কাছে পিতৃনিন্দা শুনতে চাই নে।"

"ভাল, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এর ফল ভোগ তুমি করবে। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কেই আর থাকবে না।"

বলেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল।

"কোন-কালেই তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না।" বলে সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

সেইদিন সেই মুহূর্তে সে কামনা করেছিল—সামরিক কর্মচারীর আকস্মিক আবির্ভাবের। স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে দীর্ঘক্ষণ। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। বারবার প্রশ্ন করেছিল—প্রবীর কোথায়? সে যদি আজ এই মুহূর্তে আসত!

কিন্তু অকস্মাৎ সে এ কোন মূর্তিতে এল? এ কি সে? সত্যই প্রবীর?

সুধা বউদির সামনেই সে বসেছিল, তিনি ভাঁড়ার বের ক'রে দিচ্ছিলেন—সে বসেছিল মেঝেতে একখানা পিঁড়ির উপর। কখন যে তার চোখে জল গড়িয়ে এসেছিল—তা তার ঠিক খেয়াল হয় নি। হ'লে চোখের জলে সে বাঁধ দিত, অন্তত মুছে ফেলত। বউদিই কখন তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল দেখে ফেলেছিলেন। কাছে এসে বলেছিলেন, "এখনও কাঁদছিস।"

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেললে আরতি। এবং হাসতে চেষ্টা করলে।

বউদি বললেন, "তুই এখানে স্বস্তি-বোধ করছিস নে, না?"

চুপ করে রইল আরতি। কি বলবে সে? সে কথা সত্য। কিন্তু তার চেয়েও যে কথা তার এই চোখের জল এবং বিষণ্ণ উদাসীনতার হেতু—তাও যে বলবার নয়।

ঠিক এই সময়েই সুধা বউদির বাপের বাড়ি থেকে একটি বাচ্চা চাকর এসে সুধা বউদিকে মৃদুস্বরে বললে, "একখানা চিঠি দিয়েছেন।"

বউদি বিচিত্র মানুষ। হেসে ফেলে বললেন, "মর মুখপোড়া তার এত ফিস্‌ফিসিনি কিসের। বাপের বাড়ির চিঠি, প্রেম-পত্তর তো নয়। হতভাগা!"

"না। অরুণবাবু দিয়েছেন।"

"অ! সে বুঝি পার্কসার্কাস থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে এসে বাড়ি ঢুকেছে? কই দে।"

চিঠিখানা বের করে দিতেই বউদি বললেন, "তোর চিঠি! তাই এত চুপিচুপি। তা তুই দাঁড়িয়ে থাকবি না কি? উত্তর চাই?"

"হ্যাঁ।"

আরতি চিঠিখানা খুলে পড়লে। অরুণ লিখেছে সে গিয়েছিল কপালিটোলার বাড়িতে। সেখান থেকে অনেক খুঁজে বাগবাজার পর্যন্ত। সেখানেই খবর পেয়েছে আরতি এখানে। তাকেও বাধ্য হয়ে পার্কসাকাস ছেড়ে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু এ বাড়িতে তার আসা সম্ভবপর নয়। তাই আরতিকে অনুরোধ করছে তার সঙ্গে সে যেন আজই দেখা করে। এখন নিরাপদে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সময় নয়। অনেক কাজ। এই দাঙ্গা বন্ধ করা—হিন্দু-মুসলমানের সম্বিত ফিরিয়ে আনাই প্রথম কাজ। মানুষ এরই মধ্যে লড়তে শিখে গেছে। 'এই দুটো ফাইটিং ফোর্স'কে এক করতে পারলে কি বিরাট বিপ্লবী শক্তির সৃষ্টি হবে কল্পনা কর, মনে জোর পাবে, সব অবসাদ কেটে যাবে। এই জন্যে হিন্দু-মুসলমান শিল্পী সাহিত্যিক প্রভৃতি গুণীদের নিয়ে একটা মিছিল বের করবার চেষ্টা করছি আমরা। এই মিছিলের কাজে তোমাকে

যোগ দিতেই হবে। অর্গানাইজ করতে হবে, গান গাইতে হবে। বিকেল তিনটের সময় তুমি এস—তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। চারটের সময়···র বাড়িতে মিটিং।'

এর উত্তর স্থির করতে তার একমুহূর্ত বিলম্ব হল না। না। সে বউদিকে বললে, "একটা কলম কি পেন্সিল আছে বউদি ?"

বউদি ভঁাড়ারের তাক থেকে খসড়া সংসারখরচের খাতা খুলে একটা কলম বের করে দিলেন, "এই নে। কি লিখেছে সে বাউণ্ডুলে ?"

আরতি চিঠিখানার পিঠেই লিখে দিলে—'না'। ছেলেটার হাত দিয়ে বললে, "এই নে।" ছেলেটা চলে গেলে সে উঠল বললে, "ওরা মিছিল বার করবে।"

"মিছিল ?"

"হ্যাঁ। হিন্দুমুসলমান মিলনের জন্যে।"

বউদি বললেন, "মরণ! তা তুই যাচ্ছিস না কি ? তোর তো চড়কের পিঠ, গাজনের ঢাক বাজলেই নাচে।"

হেসে আরতি বললে, "না। আর নাচে না।"

"বাঁচলাম। কিন্তু উঠলি কেন, লড়াইয়ের ঘোড়ার মত ?"

"একটা টেলিফোন করব।"

"কাকে ?"

"যাঁরা আমায় উদ্ধার করেছেন—ওই বোসেদের ওখানে। ব্যাঙ্কেও টেলিফোন করতে হবে। চেক বই তো গেছে।"

"ব'স। বাইরের ঘরে তো মুখে বাঘ-গণ্ডার বধ হচ্ছে। ওদের শেষ হোক। তারপর।"

বাইরের ঘরে তখন সত্যই বিপুল উত্তেজনা জমে উঠেছে। কোথায় কি নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছে তার বর্ণনা চলছে। চিৎপুর রোডে কলুটোলা স্ট্রীটে কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসকের বাড়িতে কত জনের মৃত দেহ পাওয়া গেছে, সে মৃতদেহগুলির কোথায় কি ক্ষতচিহ্ন ছিল—কতজন মেয়েকে পাওয়া যায় নি—তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন একজন। শোভাবাজারে কি ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছিল এক গুণ্ডা, তা কেমন করে ব্যর্থ হয়েছে তার আলোচনা চলল তারপর। শোভাবাজার প্রতীক্ষা করেছিল সশস্ত্র পাঠানদের—নৌকা বা স্টিমলঞ্চ করে তাদের এসে নামবার কথা গঙ্গার ঘাটে; কিন্তু হিন্দুদের চমকপ্রদ অভ্যুত্থানের ফলে তা সম্ভবপর হয় নি। এবং সর্বশেষে সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী করা হল—গান্ধীজীকে। তার সঙ্গে কংগ্রেসকে। তারপর সাম্যবাদী দলকে। একজন বললেন—এখন উচিত সমস্ত জাতের এক হয়ে—এই এদের বিচার করা রাস্তার ধারে ফাঁসী কাঠ পুঁতে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত।

দুপুরে বেলা সে টেলিফোন করলে। তখন তার মামাতো ভাই দুজনেই ঘুমিয়েছে। ফোন করলে বাগবাজারে কেশববাবুর ওখানে। বললে, "হ্যালো—[illegible] কি কেশব বোস মশায়দের বাড়ি?

"হ্যাঁ। আমিই [illegible]ববা[illegible], কথা বলছি। আপনি কে?"

"আমার নাম [illegible]তি সেন। কপালিটোলার·· নং বাড়ি

থেকে আপনারাই আমাকে রেস্ক্যু করেছিলেন। কাল আমি বালীগঞ্জে মামার বাড়ি এসেছি। শম্ভুবাবু বলে আপনাদের একজন আর রতন বলে একজন—"

"নমস্কার মিস সেন। ভাল আছেন তো?"

"নমস্কার। আমি ভালই আছি। আপনাদের কাছে আমার অনেক ঋণ অনেক কৃতজ্ঞতা—"

"না—না—না। এ সব আপনি কি বলছেন মিস সেন। এ তো মানুষের কর্তব্য। আর এ কতটুকু!"

"অনেকটুকু। যারা বিপদ থেকে ত্রাণ পেয়েছে আপনাদের সাহায্যে—তারাই বলতে পারে—এ কত বিপুল—এর কত ওজন। কিন্তু মুখে ধন্যবাদ দিয়ে তা শোধ করবার জন্যে আমি টেলিফোন করছি নে। আমি একটা খবর জানতে চাই। রতন বলে যে ড্রাইভারটি কাল—"

কথার উপর কথা বলে কেশববাবু বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিস সেন। অত্যন্ত দুঃখিত। শুনেছি আমি সব। কাল রতন মেজাজ ঠিক রাখতে পারে নি। একটা অত্যন্ত আনপ্লেজাণ্ট ঘটনা ঘটে গেছে।"

"আমি-আমি—।" কি বলবে আরতি ভেবে পেলে না। কিসের জন্য সে তার ঠিকানা জানতে চায়? কি করে বলবে—'যে আপনারা কি জানেন—ওর সত্য পরিচয় কি?'

"বলুন?"

"আচ্ছা, উনি কি আগে আর্মিতে—মানে যুদ্ধে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, তা গিয়েছিলেন—এই কথা কেউ কেউ বলে শুনেছি। মেজাজ বোধ হয় সেই থেকেই ওর খারাপ। তবে আমরা ওর হয়ে আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি। ও অবশ্য এমন করে না। অত্যন্ত ভদ্র। মানে আচারে ব্যবহারে অত্যন্ত ডিগ্‌নিফায়েড। কি রকম হয়ে গেছে আর কি।"

আর কী বলবে এর পর? আবার চুপ করে গেল আরতি।

ওদিক থেকে বিনীত মার্জনা চাওয়ার একটু হাসির আওয়াজের সঙ্গে কেশববাবু বললেন, "আচ্ছা—তা হলে ছেড়ে দি।"

এবার সব সঙ্কোচ ঠেলে আরতি বললে, "ওর ঠিকানাটা দিতে পারেন? আমি আসবার সময় জায়গাটা দেখেছি, কিন্তু নম্বরটা··· আমার অন্য প্রয়োজন আছে। খুব জরুরী আপনি যে-জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছেন তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনি ভাববেন না। নম্বরটা বলুন আমাকে।"

"নম্বর তো জানি না। তবে ওর ওই বস্তির ওখানে গিয়ে রতন মিস্ত্রির বাড়ি বললে দেখিয়ে দেবে। ওকে সকলেই চেনে। কিন্তু সন্ধ্যের আগে তো বাড়িতে পাবেন না ওকে। তবে বাড়িতে ওর মা আছেন, বউ আছে, তাদের বললে ওরা পাঠিয়ে দেবে। আমরা বলে দেব? এখানে তো এখন আমাদের সঙ্গে এই বিপদে কাজ করছে।"

চমকে ওঠল আরতি। মা-বউ! তবে?

এই মুহূর্তে ওদিক থেকে আবার কথা এল, "এই যে রতন এসেছে। কথা বলুন।" এবং তার পরেই অপেক্ষাকৃত মৃদু

এবং অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলে, "তোমাকে ডাকছেন রতন, টেলিফোনে।"

"আমাকে ?"

"হ্যাঁ। সেই ভদ্রমহিলা। কপালিটোলার বাড়ির—"

"বলে দিন—ওঁদের যা খুশি করুন। আমি তার কী বলব ?"

"না-না। উনি বলছেন সে জন্যে নয়। অত্যন্ত জরুরী বলছেন। শোন না কী বলছেন! খুব ব্যগ্র দেখলাম। ধর।"

"হ্যালো!" সেই ভরাট কণ্ঠস্বর। অনুচ্চ হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

আরতি একেবারেই বললে, "প্রবীর!"

এক মুহূর্ত বিলম্ব! উত্তরের প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে একমুহূর্ত দেরি। তারপরই উত্তর এল, "আমার পুরো নাম রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য।"

"না। প্রবীর। রতন ভট্টাচার্য কে তা জানি না, কিন্তু শেয়ালে কামড়ানোর সেই দাগ—"

"মাফ করবেন। আমার অনেক কাজ, আমার সময় নেই।"

টেলিফোনটা খট করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল। রিসিভার নামিয়ে দিয়েছে সে।

আরতির সন্দেহ আরও দৃঢ় হল—এ সেই প্রবীর।

কিন্তু মা-বউ? মা তো তার কলেজ-জীবনের আগে মারা গেছেন। মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর [illegible] হয়ে, কেমন বউকে নিয়ে বস্তিতে বাস করছে? সব ঝাপসা হয়ে গেল! যেন

একখানা সদ্য আঁকা ছবির উপর হাত দিয়ে নেড়ে ঘেঁটে সব লেপে অস্পষ্ট দুর্বোধ্য করে দিল।

মূঢ় বিস্ময়ে উত্তরহীন শত প্রশ্নে জর্জর হয়ে সে সেদিন সারা-রাত জেগে বসে রইল। তবু তার দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রবীর। কিন্তু এ তার স্মৃতি বিভ্রম? না—অন্য কিছু?

॥ সাত ॥

সেদিন প্রবল বর্ষণ। প্রচণ্ড। হয়তো বা পঞ্চাশ একশো বছরে একসঙ্গে এত বৃষ্টি কলকাতা শহরে হয় নি। পথ ডুবছে ঘাট ডুবছে, ক্রমে ক্রমে বাড়ির মধ্যে জল ঢুকছে। বৃষ্টির তবু বিরাম নেই। কলকাতার পথে পথে গলিতে গলিতে আবর্জনার স্তূপ জমেছিল। এই হানাহানির মধ্যে কর্পোরেশনের আবর্জনা পরিষ্কারের অর্থাৎ বোমপুলিশের কাজ পঙ্গু হয়েছিল। শুধু তাই কেন? পথে গ্যাসবাতি জ্বলে নি, ইলেক্‌ট্রিক জ্বলেছে সুইচ টিপে চালানোর সুযোগে। পোড়া বস্তী ধোঁয়াচ্ছিল। রক্তের দাগে নানান স্থান রক্তাক্ত হয়েছিল; পচে দুর্গন্ধ উঠছিল। হিন্দু-মুসলমানের এলাকার সংযোগস্থলগুলিই লাল ইশারার এলাকা; সেখানে অলিগলির মোড়ে মোড়ে হিংস্র মানুষের উঁকি মারামারি চলছিল অবিরাম। আজ এই মুষলধারায় বর্ষণের মধ্যে সব অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে কিছুক্ষণের জন্য।

বউদি বললেন, "ভগবান সব ধুয়ে মুছে দিচ্ছেন। মানুষের লজ্জা ঢাকছেন। লজ্জাও নেই কিনা। নিজে গড়েছেন। তার চেয়ে গঙ্গা-সাগরের ঢেউ এনে সব ডুবিয়ে চুবিয়ে মারত তো বুঝতাম ভগবান! বিচার!"

আরতি জানালার ধারে বসে এই বর্ষণ দেখছিল আর ভাবছিল। তার মনে পড়ছিল বিয়াল্লিশ সালের সেই সাইক্লোনের দিনের সেই বর্ষণের কথা। প্রবীর এসেছিল গামবুট পরে—খিচুড়ির উপকরণ নিয়ে।

নিচে ক'দিন ধরেই সেই একই আলোচনা চলেছে। পাতুদা আজ আর শুধু বাক্যবীর নেই; এর আগে যুদ্ধের আমলে যা-ই করে থাক্—এক বিন্দুকে বিপুল সিন্ধু বলে যতই প্রচার করে থাক, এখন ঠিক আর তা নেই। আজ একটা কিছু করবে বা করতে চাচ্ছে। আর-এস্-এস্-এর লোকজন আসছে যাচ্ছে। পাশের বাড়ি কাদের অর্থাৎ নতুন ভাড়াটে কারা তা ঠিক জানে না, তবে আলোচনা শুনে মনে হয় ওরা হয়তো কংগ্রেসী। ওদের কথার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গার অপরাধ বিচারে নিখুঁত ইতিহাস আলোচনা চলছে। সেই প্রথম আমল থেকে এ পর্যন্ত থাকে থাকে এদিকের ওদিকের অপরাধের ফাইল পরের পর খোলা হচ্ছে। মুসলিম লীগকে শুধু ষোল আনার পরিবর্তে আঠারো আনা অপরাধে দায়ী করা হচ্ছে। এই কারণেই মনে হয় এরা কংগ্রেসী। ইতিহাস কম্যুনিস্টদের সব ঘটনার আদি অকৃত্রিম-পটভূমি। সুতরাং কম্যুনিস্ট হতে পারত কিন্তু তা নয় এই কারণে যে তাহলে ওই আঠারো আনা দায়ের ন-আনা কংগ্রেসের উপরে নিশ্চয় চাপাত।

বিচারে দোষ দায় যার হোক, এ দাঙ্গায়—কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মুসলমান হটেছে এবং হেরেছে। আক্রমণ তারাই করেছিল এ সত্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণার মধ্যে স্বীকৃত। তাদের প্রত্যাশা পরিকল্পনা যাই থাক—সব ব্যর্থ হয়েছে। পাশের বাড়িতে কাল কেউ আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলেন—একজন মুসলিম লীগ এম-এল-এ বাড়ি পৌঁছেছেন—শবের মত বিবর্ণ চেহারা নিয়ে। রাজনীতি থেকে তিনি চিরদিনের মত সংশ্রব ছিন্ন করছেন। প্রতিজ্ঞা করেছেন।

আর একজন বললেন—চিরদিনের মধ্যে এই কয়েকটা বছর স্বতন্ত্র। এর মধ্যে কেউ একা বসে আপনার চিন্তা বা শুধু আপনার ভাল-মন্দ নিয়ে থাকতে পারে না। অসম্ভব।

কথাটা বারেকের জন্য আলোড়ন তুলেছিল আরতির মনে। নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল—তাই তো, সে কেমন করে ভাবনাহীন এক দিগদিগন্তহীন সমুদ্রতুল্য বিষণ্ণ উদাসীনতার মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে প্রবীরের ভাবনা—রতন সম্পর্কে প্রশ্ন তার স্তিমিত হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে ভুল—এ তার ভুল। হয়তো ভুল না হয়েও ভুল। মা-বউ নিয়ে সে সংসার করছে। ইঞ্জিনীয়ার নয়—মোটর ড্রাইভার। স্মৃতি-বিভ্রান্ত মানুষ ফিরে এসে বিবাহ করেছে, সংসার পেতেছে ; মা যিনি তিনি ওর মা নন, ওই বউটির মা সুতরাং ভুল না হয়েও ভুল। নিজের দিক থেকে হিসেব করেছে। দেখেছে ভুল এখানে। সে মনে করেছিল প্রবীরকে সে ভুলে গেছে। সে জানতে পারে নি—বুঝতে পারে নি—তার জীবনের কামনা বাসনা আশা কতখানি প্রবীরকে জড়িয়ে ছিল। সে কাজ নিয়ে মেতেছিল—সে শুধু ছোটছেলের দিনের বেলার খেলার আসরের মত। এই ভুলগুলিই তার আসল ভুল। তাই আজ অকস্মাৎ এই দাঙ্গার মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যায় আপনজন-হারা ছোট্ট মেয়ের মত অকস্মাৎ নিতান্ত একলা হয়ে গেছে।

আজ প্রবীরকে ডেকে প্রশ্ন করতে যাওয়ারও কোন মানে হয় না। আর এই বিপুল জনতার স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়ে দেওয়ারও কোন যোগ খুঁজে পাচ্ছে না। সে যেন তীরের কাছে ঘাসের সঙ্গে

আটকে গেছে। জলস্রোত তীরবেগে কলকল শব্দে ছুটে চলেছে। সংসারের মধ্যে ওই ভদ্রলোক যাকে অসম্ভব বললেন—সে সেই অসম্ভব। তার মনের অবস্থা কেউ বুঝতে পারবে না। সে-ও বোধ হয় বোঝাতে পারবে না। যে বিধবার একমাত্র পুত্র গেছে অকস্মাৎ—তার মন যেমন আজ সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্তব্ধ গতিহীন; অভিসম্পাত নেই, আক্ষেপ নেই; আবার বিপ্লবের মুখে সংঘর্ষের মুখে—ঢালের নদীর মত জীবনের ধাবমানতা—তার সঙ্গেও তটভূমির গোস্পদের জলের মত কোন যোগ নেই—ঠিক তেমনি।

কখন বউদি এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "বৃষ্টি দেখছিস?"

সে বললে, "হ্যাঁ।"

বউদি হেসে বললেন, "নবীন মেঘের সুর লেগেছে মনে-ভাবনায়?"

আরতি বললে, "তুমিও কাব্য কর বউদি?"

"করি নে। তবে ছিল বই কি মনে রে। আজ তোর চুপ ক'রে বসে থাকা দেখে চাপা কাব্য উথলে উঠল। হাসির ছল'টা পেলাম। কদিন থেকেই ছলছুতোটা খুঁজছিলাম। তোর কি হয়েছে বল তো? তুই অমন হয়ে গেলি কেন? সেদিন গঙ্গাজল মাথায় ঢালতে বলতেই বলেছিলি না বউদি দরকার নেই। তোর গল্প শুনেছি; অবিশ্বাসের কিছু পাই নি; আর তুই আমার কাছে কিছু লুকোস নি—লুকনো তোর স্বভাব নয় এও জানি। তবে তুই

এমনি·ক'রে আছিস কেন ? তুই সর্বদা যেন কোন দুঃখের মধ্যে ডুবে আছিস। তোকে এক সময় ডেঁপো মেয়ে বলেছি তোর বক্তৃতার বহর শুনে ; তোর হল কি যে তুই এমন বোবা হয়ে গেলি !"

আরতি চুপ করেই রইল, ভাবছিল কি বলবে !

সুধা আবার প্রশ্ন করলেন, "আরতি ?"

আরতি বললে, "হয়েছে বউদি পরে বলব। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছি।" আবার একটু ভেবে নিয়ে বললে, "নিজের যে কথাটা নিজে জানতাম না, সেই কথাটা সেই ধাক্কায় হঠাৎ জানিয়ে দিলে। একবারে যেন ফকীর হয়ে গেলাম বউদি।"

"অরুণের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে—অথচ মনে হচ্ছে—"

"দূর ! অরুণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

"তবে ?"

"বলেছি তো পরে বলব।" তারপর হেসে বললে, "ভেবেছিলাম আজ ব্যাঙ্কে যাব, চেক বই নিয়ে আসব। ওরা যেতে লিখেছে কিন্তু এ বৃষ্টিতে তো হয় না। বসে বসে বৃষ্টি দেখছি। আর ভাবছি। কাটা ঘুড়ির মত গাছের ডালে আটকে গেছি বউদি। না পাচ্ছি মাটি, না পাচ্ছি আকাশ।"

সেদিন ১লা সেপ্টেম্বর।

দাঙ্গা ধিকিধিকি আগুনের মত জ্বলছেই, জ্বলছেই, এই নিভছে এই দপ করে অন্যত্র জ্বলছে। মানুষ বেরিয়ে ঘণ্টাখানেক না

ফিরলেই আর ফিরবে না—এইটেই শতকরা নব্বুই ভাগ নিশ্চিত। বিশেষ ক'রে হিন্দু মুসলমান এলাকার সংযোগস্থল যাকে পার হ'তে হবে। রাত্রে এখনও বন্দেমাতরম্ জয়হিন্দ ধ্বনি ওঠে। অন্যদিকে ধ্বনি ওঠে—আল্লাহো আকবর, নারায়ে তকদীর! রাত্রে বস্তি জ্বলে। বস্তিতে হানা পড়ে। মফস্বলে এ আগুন ছাড়চ্ছে।

অরুণদের মিছিল ঘুরে এসেছে। বড় বড় বক্তৃতা হয়েছে। বাংলার লাটসাহেব থেকে মন্ত্রী থেকে নাম-করা রাজনৈতিক নেতারা রেডিয়োতে বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু সব খবর আরতির মনে নেই। শোনেও নি সব। সে শুধুই ভাবচে। 'মা, বউ'! এরপর কি হবে খোঁজ করে? কি প্রয়োজন তার তাকে মনে করিয়ে দিয়ে এবং ওই বউ আর বউএর মাকে সত্য কথা বলে? স্মৃতি-ভ্রষ্ট মোটর ড্রাইভারকে,—তুমি ড্রাইভার নও, তুমি ইঞ্জিনীয়ার; তুমি রতন বা রত্নেশ্বর নও, তুমি প্রবীর—এ বলে কি হবে? জীবনটা তার শুধু অশান্ত প্রশ্নে ভরে উঠবে। আর ওই মা-বউ তার কাছ থেকে সভয়ে সরে যাবে; সহজ সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন ব্যাঙ্কে গিয়ে শোভাবাজারের পথ থেকে সে এই ভেবেই ফিরে এসেছে। যে হারিয়েছে সে হারাক। কি করবে? তাকে ভুলতে হবে। ভুলে যাওয়া মানুষের স্বভাব-ধর্ম। সংকল্প করে এসেছিল মনকে বাঁধবে সে। মনকে বেঁধে আবার কাজে নামবে। তবে অরুণের সঙ্গে বা আর কারুর সঙ্গে মিছিলের কাজে নয়। নিজের জন্য একটি নির্দিষ্ট কাজ। সে দিক দিয়ে ভাববার সময় হয়েছে তার। কপালি-টোলার বাড়ি নামেই রইল, কাজে ও বাড়ি গেছে। ও বাড়িতে

আর বাস করবার কল্পনা করতে পারে না সে। বাংলাদেশে মুসলমান গরিষ্ঠতাও থাকবে—রাষ্ট্রশক্তিও থাকবে। ও-পাড়ায় মুসলমান প্রাধান্য ; ওরাই ঢুকে বসে থাকবে। ভাড়াও দেবে না, বিক্রীও হবে না। হ'লে নাম-মূল্যে। পার্কসার্কাসে এরই মধ্যে বাড়ি বিক্রী শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যত তার সম্মুখে প্রশ্নের ভঙ্গি নিচ্ছে। ব্যাঙ্কে মজুত বিশেষ নেই। তাকে কিছু করতে হবে। কি করবে ? কি করবে তা জানে না কিন্তু যাই করুক কলকাতার বাইরে। এখানে প্রবীর আর রতনের প্রশ্ন কখন যে তাকে চঞ্চল অধীর ক'রে তুলবে সে তা বলতে পারে না। কখন কোন অতি ব্যস্ত মুহূর্তে বিচিত্রভাবে জেগে উঠে সব পণ্ড করে দেবে।

তাই দিচ্ছে। এ ক'দিন ধরে তাই হচ্ছে। হঠাৎ কৌতূহল বিস্ময় নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খবরের কাগজে 'চাকরী খালি'র বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ পড়ে যায় 'হারানো-নিরুদ্দেশ' কলমটার উপর। 'লম্বায় সাড়ে পাঁচফুট, বাঁ চোখের ভুরুর উপর লম্বা কাটা দাগ—' আর পড়তে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় প্রবীরের সেই হাতের দাগ। অথবা 'রং অসাধারণ ফরসা, মাথার চুল কটা, মাথায় ছিট আছে'—। অমনি মনে পড়ে প্রবীরকে ! স্মৃতিভ্রষ্ট প্রবীর।

সেদিন ১লা সেপ্টেম্বর ওই বিজ্ঞাপনটা ছিল। তার মনে পড়ে গেল স্মৃতিভ্রষ্ট প্রবীরকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত একটা নতুন প্রশ্ন জাগল তার মনে। স্মৃতিভ্রষ্ট ? স্মৃতিভ্রষ্ট যদি তবে সেদিন কথা এমনভাবে কইলে কেন ? সুরে অর্থে যেন কি একটা ছিল।

—হ্যাঁ কি একটা ছিল ; সে যেন কথা কইতে চাইলে না। লাটু তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিল—তাতে তার রাগ হওয়াই উচিত কিন্তু—। ও চিন্তা শেষ হবার পূর্বেই আর একটা নতুন প্রশ্ন জাগল। স্মৃতিভ্রষ্ট? স্মৃতিভ্রষ্ট তো হাতে শেয়ালের কামড়ের দাগটার স্মৃতি তার মনে থাকল কি করে? কি করে? প্রশ্নটা উচ্চচীৎকারে তার অন্তর থেকে কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল ; 'কি' শব্দটা বেরিয়েও এল, 'কি' বলে সে বিষাক্তকীটের দংশনে চকিত চমকিত ব্যক্তির মত উঠে দাঁড়াল। ঘরের ওপাশের আলমারিটার গায়ের আয়নার নিজের প্রতিবিম্ব দেখে থমকে দাঁড়াল। পর মুহূর্তে সম্বিত ফিরল তার। কি করছে সে? এ যে পাতুদাদাদের বাড়ি। অনেকক্ষণ জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। চিন্তা আর কিছু নয় ; যাবে? অথবা—যাবে না? গিয়ে ফল কি? যাবারই বা অধিকার কি?

আছে বৈকি অধিকার। সে তো তাকে ভাল বেসেছিল। তাকে 'রতি' বলে ডাকবার জন্যে এসেছিল। সে তো তার পত্রেই সে লিখেছিল। বলবার অবকাশ হয় নি বা তার সেদিনের সঙ্গীদের দেখে বলে নি ; সে দায়িত্ব তার নয়। মুখের কথায় প্রকাশ করে নি বলেই তার অন্তরের সত্য মিথ্যা হয়ে গেছে! আরতি তার কত সন্ধান করেছে। কত রাত্রি জেগে তার কথা ভেবেছে। আজও তাকে ভুলতে পারে নি ; পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্রবহীন হয়ে নিজের মধ্যে ডুব দেবার সে অবকাশ পায় নি এ কথা ঠিক। তাতেই কি তার দাবী মিথ্যা হয়ে যাবে?

দাবী ?।

ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। যে বৈচিত্র্য সুধাবউদির হাসিতেও ফুটে ওঠে পাতুদার প্রসঙ্গে। দাবী তার গেছে। বহুচারী পুরুষেরা এমনি করেই চিরকাল মেয়েদের দাবী—আইনের ফাঁকে, গায়ের জোরে বাতিল করে দেয়। তার দাবী নাকচ করে দেবার অধিকার নিয়ে এসে দাঁড়াবে তার বউ। বলবে—'তোমার দাবী ? বেহায়া কোথাকার ? সাতপাক জড়িয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, মন্তর পড়ে। আর ও বলে—দাবী !'

কিন্তু সে বউ কেমন ? যাকে দেখে ভুলে ইঞ্জিনীয়ার প্রবীর আজ মোটর ড্রাইভার রতন হল সে কেমন ? রূপ ছাড়া দেহ ছাড়া তার কি থাকতে পারে ?

সে এবার অধীর হয়ে উঠল। সে যাবে। সে একবার দেখবে। আর একবার প্রবীরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করবে—কেন সে তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে ? আর কেন সে এমন করে মোটর মিস্ত্রী সেজে আছে ? কেন ?

যাবে সে। বস্তীটা সে চেনে। কেশববাবু বলেছিলেন—যে কোন লোককে বললেই রতন মিস্ত্রীর বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

•

শোভাবাজার বস্তিতে এসে সে দাঁড়াল। হাবু গুণ্ডার বস্তিটার পোড়া দাগ সেদিনের প্রবল বর্ষণের পরেও শুকিয়ে-যাওয়া ক্ষতের উপর কালো মড়মড়ির মত দেখাচ্ছে। প্রবীরের হাতের দাগের মত। একদিন দেখলেও জায়গাটা চিনতে দেরি হল না।

সে দাঁড়াতেই দশ বারো জন লোক বেরিয়ে এসে দূরে দূরে দাঁড়াল। তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। অপরিচিত আগন্তুককে এই দাঙ্গায় কেউ বিশ্বাস করে না। নানান বিচিত্র সন্দেহ। সরকারী অর্থাৎ লীগ সরকারের গুপ্তচর! হয়তো আর কিছু!

অনেকগুলো ছেলে বরং কাছে এল। একজন বললে, "কি চাই আপনার?"

"রতন ভটচাজ মোটর মেকানিকের বাড়িটা কোথায় বলতে পার?"

"রতনদা? রতনদাকে খুঁজছে বটুদা!" কথাটা বললে বয়স্কদের —যারা দূরে অপেক্ষা করছিল।

"কি দরকার আপনার? গাড়ি মেরামত বুঝি?" এগিয়ে এল বটু।

আরতি বেঁচে গেল কৈফিয়ৎটা পেয়ে। সে বললে, "হ্যাঁ।"

বটু বললে, "সে তো এখন বাড়ি নেই। কাজে বেরিয়েছে।"

"তার বাড়িটা কোথায়?"

"বাড়ি তো ওইটে। ওই যে। এই কষ্কে তুই যা না—দেখিয়ে দে। তুই হুঁকোর ভাই,—হুঁকো তো মোটরের কাজ করে। তোকে কিছু বলবে না।

বাচ্চা একটা ছেলে—হুঁকোর ভাই কষ্কে। সে সঙ্গে যেতে যেতেই বললে, "রতনদা'র মা ভারি গাল দেয় কেউ ডাকলে। রতনদা'র বউ খুব সুন্দর কিনা তাই ভাবে—।" ফিক করে হেসে ফেললে সে।

"খুব সুন্দরী ?"

"খুব। রাজকন্যার মত। রতনদা খুব ভালবাসে বউকে। ওই ওইটে। কড়া নেড়ে ডাকুন।"

প্রকাণ্ড একটা লম্বা জায়গার উপর একটানা টিনের দেওয়াল, টিনের চাল, লম্বা গুদামের মত একটা বস্তি। টিনের দেওয়ালে সারি সারি জানালা, মধ্যে মধ্যে দরজা। দশ-বারোটা দরজা, খানিকটা পর পর। আরতি বললে, "তুমিই একটু ডাক না।"

কল্কে বললে, "আপনি ডাকুন। রতনদা তো নেই। সে তো কাজে গিয়েছে। বললাম তো ওর মা কানা, ভারী বজ্জাত। ডাকিনীর মত গালাগাল করে। কড়া নেড়ে ডাকুন। বাবা; ওই জন্যে ওই উঠোনে আর কে-উ থাকে না। মায়ের জন্যে রতনদাকে সবটাই ভাড়া নিতে হয়েছে। তবে রতনদার বউ খুব ভালো। ডাকুন।"

কড়া নাড়লে আরতি। একটা তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণু নারীকণ্ঠের আওয়াজ উঠল, "কে-রে ? কোন্ চ্যাংড়া ? কি চাই ? মস্করা—না ?"

কটু বাক্যের জন্যে প্রস্তুত থাকলেও—একবার কড়া নাড়ায় এতগুলি তীক্ষ্ণ বাক্য শুনবে—আরতি এ প্রত্যাশা করে নি, সে একটু দমে গেল। তবুও বললে, "আমি রতনবাবুকে চাই।"

"মেয়েছেলে ? কোন মেয়েছেলেকে রতনের আমার দরকার নেই।"

"আছে। কাজ আছে আমার। জরুরী কাজ। খুব জরুরী।"

একটি মেয়ের মুখ উঁকি মারলে এবার। চকিতের জন্য। কিন্তু সেই চকিত দেখার মধ্যে তাকে যতটুকু দেখা গেল, তাতেই চমকে উঠল আরতি।

এ কী রঙ! এ কী চোখ! আশ্চর্য দৃষ্টি! শান্ত প্রসন্ন নীলাভ দুটি গোধূলি-তারার মত! রঙ টকটকে ফরসা বলে ঠিক মনে হল না, কিন্তু অপরূপ মাধুরী! এই বউ?

তখন ভিতর থেকে বউটি বলছিল, "কোন ভাল ঘরের বাবু মেয়ে মা!"

"ভাল ঘরের বাবু মেয়ে?"

"বোধ হয় গাড়িটাড়ি খারাপ হয়েছে বড় রাস্তায়, কেউ বলেছে, তোমার ছেলের কথা!"

"বলে দাও, সে বাড়িতে নাই। ওই সেই শ্যামবাজারের দাঙ্গার আপিস দেখতে বল।"

আরতি বললে, "আমি অপেক্ষা করব। দেখা আমাকে করতেই হবে।"

এবার বউটি সামনে এসে দাঁড়াল। মুগ্ধ হয়ে গেল আরতি। এত রূপ। এত মাধুরী! এত প্রসন্নতা? প্রসন্নমুখে স্মিত হেসে সে বলল, "আসুন!"

নিতান্তই বস্তি। ছোট একটুকরো উঠানের দুপাশে ঘর—অন্য দুপাশে একটুকরো করে টিনের চালা এবং একটুকরো ঘর। রান্নার ব্যবস্থা সেখানে।

"কোথায় বসবেন এখানে? আমাদের এই ঘরে—?"

"ঘরেই বসব!" বউটির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে সে তখনও চেয়ে ছিল। মেয়েটি বয়সে তার থেকে ছোট। কুড়িও এখনো হয় নি।

ওপাশে ঘরের দরজায় বসেছিল এক বৃদ্ধা। সাদা ঘোলাটে

চোখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল—কী বলছে বউ ফিসফিস করে! বললে, "ফিসফিস করে কী কথা?"

বউটি একটু অপরাধের হাসি হেসে বললে, "কথা একটু জোরে বলুন। চোখে তো দেখতে পান না। কথা না শুনতে পেলে রেগে ওঠেন। মাথাও খারাপ। উনি যখন যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন আট মাস দশ মাস কোন খবর ছিল না। তখন লোকে বলত, উনি মারা গিয়েছেন।"

একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে, "তখনই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন! ওই এক ছেলে তো!"

"বলি ওলো হারামজাদী! কথা কানে যায় না? কিসের ফিসফিসিনি? অ্যাঁ?" এবার বুড়ী চিৎকার করে উঠল।

হেসে বউটি বললে, "না মা, ফিস্‌ফিসিনি নয়, বলছি, বড় ঘরের মেয়ে আপনি, কোথায় বসবেন এখানে?"

শান্ত হয়ে বৃদ্ধা বললে, "ঘরে বসাও।" তারপরই বললে, "হুঁ, বড়ঘরের মেয়ে, সুবাস উঠেছে; গন্ধ মেখেছে বুঝি? গাড়ি বুঝি আর কেউ সারাতে পারলে না? সে রতন এসে হাত দিলেই ফের ভরভরিয়ে ধোঁয়া ছুটতে লাগবে।"

বস্তির মতই ছোট টিনের ঘর। কিন্তু আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা। একখানি একজনের মত তক্তপোশে একটি পরিচ্ছন্ন বিছানা। একটি সস্তা টিপয়ের উপর ধবধবে সাদা একখানি চাদরের টুকরো। তার উপর একটি ছোট ফুলদানিতে রাঙা টকটকে এক গুচ্ছ ক্যানা। মলাট-ছেঁড়া একখানা ইংরিজি বই। মাথার দিকে দেওয়ালে তুখানা

ছবি। গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র। ওদিকের দেওয়ালে কয়েকখানি দেবদেবীর ছবি।

খটকা লাগল। প্রবীর গান্ধী বা সুভাষচন্দ্র কারও ভক্ত কোনদিন ছিল না। আর একখানা ফটো। যুদ্ধের পোশাকে একটি তরুণ সৈনিকের ফটো। মুখে দাড়িগোঁফ, বুকে হাত জড়াজড়ি করে বেশ বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ফটোর তলায় একটি ফুল। কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। কে? প্রবীর নয়? না; সাদৃশ্য আছে, কটা চোখ, দাড়িগোঁফ, সব আছে, কিন্তু তবু সে নয়। কই ডান হাতের অর্ধেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দাগ কই?

আরতি হেসে বললে, "এ তো তোমার স্বামীর ছবি।"

"হ্যাঁ, যুদ্ধে যাবার আগে শখ করে তুলিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

"যুদ্ধে যাবার আগেই তোমার বিয়ে হয়েছে? কই তেমন তো লাগে না।"

হেসে বউটি বললে, "যুদ্ধের অনেক আগে। দু'বছর আগে।"

আরতি চমকে উঠল। তবে ঘটনাটা কি? একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলে, "ছবিতে ফুল দিয়েছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"জীবন্ত লোকটা থাকতে ছবি পূজো করেছ?" কোথায় একটা কি খটকা লাগছে। প্রশ্নটা আপনি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

মুহূর্তের জন্য মেয়েটি কেমন হয়ে গেল। তারপর বললে, "তাও করি, ছবিতেও ফুল দিই। তাতে দোষ কী হল?"

"দোষ না। তবে এ-যুগে এমন ভক্তি তো দেখি নে!"

মেয়েটি ফস করে বলে উঠল, "এ-যুগে এমন ভালবাসাও হয়তো নেই, তাই দেখেন নি। দেখেন নি, দেখে যান।"

মেয়েটি কথা বললে না, যেন দপ করে জ্বলে উঠল। আরতি অবাক হয়ে গেল একটু। একটু কৌতুক-হাস্যও উঁকি দিল তার ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু কৌতুকবশে কিছু বলবার আগেই মেয়েটি আবার শান্ত হেসে বললে, "হাসছেন? তা একালের মেয়ে তো আমি নই। আমার কথা—"

বাধা দিয়ে আরতি সেই কৌতুকের বশেই বললে, "কোন্ কালের তুমি? আদ্যিকালের?"

"বলতে পারেন। একালে জন্মেও আদ্যিকালেরই বটে। আপনি একালের লেখাপড়া শেখা কলকাতার বাবুঘরের মেয়ে। আমার বাবা পাড়াগাঁয়ের ভটচাজ পণ্ডিত। স্বামীও ভটচাজ বাড়ির ছেলে। বয়েসে বদ্যিবুড়ি না হলেও আদ্যিকালের ছাড়া আর কি? আমাদের এসব আপনি বুঝবেন না।"

"বুঝব না? না-না। বুঝি বৈ কি, স্বামী দেবতা—"

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে, "মানে জানা আর মনে মানেটা বুঝতে পারা তো এক কথা নয়। আগুনে হাত না পুড়লে হাত পোড়া কি আগুন কি তা কি কেউ শুনে বুঝতে পারে? আপনারা ঠিক এসব বুঝবেন না। তবু শুনতে চাচ্ছেন শুনুন—মানুষ দেবতা হয়, তবে সে অনেক কালে একজন। আমরা ছেলেবেলায় বেরতো করেছিলাম, রামের মত, শিবের মত, স্বামী পাব। আরও করেছি, নারায়ণকে স্বামী পাব। তার মানে—বাবা বলেছিলেন আমি

তা মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে বুঝেছিলাম তার মানে হল, পৃথিবীর সব কালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুরুষোত্তমকে স্বামী পাব। পুরুষোত্তম বহুকালে একজন আসেন। তাঁকে যে পায়, সে হয় সীতা, নয় সতী, নয় রুক্মিণী। নয় গোপা, নয় বিষ্ণুপ্রিয়া। বাকী মেয়ের মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই থাকে। তাই তো সব মেয়েই ষোল আনা সুখী হয় না। সে আপনাদের কালে, আপনাদের মধ্যে আমাদের চেয়ে আরও অনেক বেশী। সে অসুখের পুরনো ওষুধ আমরা মানি। আপনারা মানেন না। আপনারা যার সঙ্গে বনলো না তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে আর একজনের হাত ধরেন। তার সঙ্গে না বনলে আর একজন; ও নিয়মটা ভাল বলে মানলে—জনের পর জন। কিন্তু শেষে বহুজনকে ধরেও মনে মনে মনে যাকে চাই তাকে পাওয়া হয় না; সব শূন্যই থেকে যায়। তাই আমরা যাকে পাই, সেই পুরুষের মধ্য দিয়েই ভজি সেই পুরুষোত্তমকে। ঘর আমরাও অবশ্য ছাড়ি। সে হল মীরার ঘর ছাড়া। কিন্তু সে তো সহজ নয়। আর খোঁপাতে ফুল পরি, পুরুষের বুকে পরিয়ে দিই, শুধু ছবির পায়ে দিলেই দোষ?"

তক্তায় বসে অল্প অল্প পা দুলিয়ে মেয়েটি বেশ লজ্জার সঙ্গেই কথাগুলি বলে গেল। যেন কোন অন্তরঙ্গ সখীকে গত রাত্রির বাসরের কথা বলছে।

অভিভূত হয়ে গেল আরতি। ভটচাজ-কন্যাটিকে দেখে যত নিরীহ মনে হয়েছিল তা তো নয়। এ যে ছোট্ট আকারের মহা-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। খোঁচাটা হয়তো বেশীই একটু লেগেছে। কিন্তু কথা কয় তো বেশ গুছিয়ে। মূর্খ যাকে বলে তা তো নয় এ-মেয়ে,

এবং চেহারায় যত নরম এবং মিষ্টি হোক, আসলে এ মেয়ে অত্যন্ত শক্ত এবং এর মিষ্টতার মধ্যে ঝাঁজ আছে। কথাগুলিও তো সোজা নয়! এ মেয়েকে তবে প্রবীর প্রতারণা করেছে? না হলে যুদ্ধের আগে বিয়ের কথা বললে কেন মেয়েটি?

আরতির স্তম্ভিত দৃষ্টির দি মেয়েটিই আবার বললে, "বলেছিলাম তো এসব সেকেলে কথা আপনার ভালও লাগবে না, হয়তো মানে খুঁজেও পাবেন না। আপনাদের কথা শুনেও তা-ই হয় আমাদের। এমনিই হাসি পায়, কখনও কখনও বা ভয় হয়।"

মেয়েটির শেষ কথা কটায় খোঁচা আছে; কিন্তু সে তার গায়ে লাগল না, সে স্তব্ধ হয়ে রইল। মেয়েটিও চুপ করলে—বোধ করি উত্তরের প্রত্যাশায়। বাইরে বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বকেই চলেছে। কী বকছে, সেদিকে কান দেবার মত অবস্থা নয় আরতির। এ-আলোচনায় কৌতুক অনুভব করবার মত মনও নেই আর। মনের মধ্যে সব মানুষেরই একটা ঝাঁপি-চাপা সাপ আছে, সেটাকে ফোঁস করতে দেওয়ায় লজ্জা আছে। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যদি ইতর জীব হয়। কিন্তু মেয়েটা যেন খোঁচা দেবার কাঠিটা উদ্যত করেই আছে। আরতি নিজেকে সংযত করে, কথার মোড়টা ফিরিয়ে দেবার জন্যই বললে, "তোমার নামটি কী বল তো? বেশ কথা বল তুমি।"

"নাম?" মেয়েটি যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল।

"নাম বলতেও লজ্জা?"

"একটু।" বলতে গিয়েও হেসে ফেললে, "মানে নামের আমার

বদল হয়েছে। বাবা আমার নাম রেখেছিলেন সতী : বিয়ের সময় আমার পিসশাশুড়ীর সতী নাম বলে পাল্টে রাখা হল সীতা। তারপর উনি যুদ্ধে গিয়ে নিখোঁজ হলে শাশুড়ী বললেন, 'ওই সীতা নামের দোষ।' তাই উনি ফিরে এলে বললেন, 'ওই নাম আমি আগে পাল্টাব।' তা উনি হেসে বললেন, 'তা হলে এমন রূপ যখন তোমার বউয়ের, তখন সতীর সীতা হয়ে কাজ নেই, সতী হোক রতি। আমার এই নিখোঁজেই তো মদনভস্মের ফাঁড়া পার হয়েছে।' আমার নাম রতি।"

আরতি যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

এর কয়েক মুহূর্ত পরেই ভরাট কণ্ঠস্বরের ডাক বাইরের দরজায় বেজে উঠল, "মা।"

"বাবা!"

বৃদ্ধার এ-কণ্ঠস্বর কল্পনা করা যায় না। কঠিন বরফের স্তর গলে যেন জলধারা হয়ে ঝরঝর শব্দে সঙ্গীতময় হয়ে ঝরে পড়ছে। কলধ্বনি তুলে পৃথিবীর বুকের তৃষ্ণা হরণ করে ছুটে চলেছে।

"তোর জন্যে একটি বাবুঘরের মেয়ে সেই থেকে বসে আছে। বেচারীর গাড়ি কেউ ঠিক করে দিতে পারে নি। আহা যা বাবা, দিয়ে আয়। খেতে না-হয় একটু দেরিই হবে!"

আরতি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মুহূর্তে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে।

বিহ্বল, মুহূর্তের জন্যও বিহ্বল হল কিনা কে জানে, কিন্তু এক

মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নমস্কার করে বললে, "নমস্কার। চলুন আপনার গাড়ির কী হয়েছে দেখি!"

আরতি কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েই ছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণাতিতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে, জ্যামিতিক ছটি ক্ষেত্রকে যেমন করে সূক্ষ্ম হিসেবে মিলিয়ে দেখে, তেমনি করেই মিলিয়ে দেখছিল। 'রতি' নামের পর আর সন্দেহের কথা ওঠেই না। তবুও দেখছিল। দেখছিল তার স্থিরদৃষ্টির প্রতিক্রিয়ায় কেমন করে তার চোখ নেমে যায়! তা গেল। প্রবীরের কথায় সে বুঝলে, প্রতারণা গভীর; এদের সামনে কথাবার্তা বলতে চায় না। মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। না, সে যাবে না। এদের সামনেই প্রতারকের প্রতারণার খোলসটা ছিঁড়ে টেনে ফেলে দিয়ে তার স্বরূপটা প্রকাশ করে দেবে! কিন্তু পরমুহূর্তে বউটির দিকে তাকিয়ে সে আত্মসম্বরণ করলে; বললে, "এস!"

বেরিয়ে এল তারা বাড়ি থেকে। বৃদ্ধা বোধ করি পদশব্দ শুনে বললে, "চললি বাবা রতন? যা বাবা, কী করবি, বিপদে পড়েছে। বউ, খিল দে।"

দরজাটা ক্যাঁচ করে উঠল। সেই শব্দে ফিরে তাকাল আরতি। দেখলে দরজা বন্ধ করতে এসে বন্ধ না করে দরজার ফাঁক দিয়ে বউটি সাপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেয়েরা এ সব বুঝতে পারে। কিছু অনুভব করেছে সে।

"চলুন, গঙ্গার ধারে চলুন। সেখানে নিরিবিলি হবে।"

গঙ্গার ধারে একটি নিরিবিলি জায়গায় এসে বললে, "এখানেই বসুন।"

"বসুন বলে অতি দুর্বল প্রতারণার শনের দাড়িগোঁফ আর পরে রয়েছ কেন? সোজা সহজভাবে কথা বল। বস!"

একটু দূরে বসে সে বললে, "না; আমি আপনাকে আপনিই বলব। আমি সত্যি-সত্যিই আজ মোটর-মিস্ত্রী, সে প্রবীর আর আমি নই।"

"কিন্তু কেন? কেন তুমি আমার সঙ্গে এ-প্রতারণা করেছ?"

"আপনার সঙ্গে? কী বলছেন মিস্ সেন?"

"তুমি আমাকে চিঠি লেখ নি? 'রতি' বলে সম্বোধন করতে আস নি শেষ দেখার দিনে?"

"এসেছিলাম, কিন্তু আত্মসম্বরণ করে ফিরেই গিয়েছিলাম। এবং যে-যে কারণে পরস্পরের উপর দাবি জন্মায়, বলুন আপনি, আমাদের আলাপের মধ্যে তেমন কোন কারণ ঘটেছে?"

"ঘটনা শুধু বাইরেই ঘটে না, মনের মধ্যেও ঘটে।"

"সে-ঘটনাও দু-রকমের মিস সেন। এক ধরনের দুর্লভ ঘটনা ঘটে, যার পর আর মন পাল্টায় না। নইলে ঘটনা তো নিত্যই অজস্র ঘটছে। আজ বন্ধুত্ব, কাল বিচ্ছেদ; আবার আপস; নয় কি? আপনার মনের ইতিহাস আমি ঠিক জানি না, তবে সে তো দাঁড়িয়ে নেই। ওই যে মাকে দেখলেন, উনি রতনের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, সে আজও সারে নি। আমাকে রতন ভেবে ফিরে পেয়ে তবে কিছু শান্ত হয়েছেন।"

হাসলে সে একটু।

আরতি বললে, “নাঃ। সেজন্যে মনে কোন ক্ষোভ নেই। লোভ জিনিসটা সাময়িক ; সেটা প্রেম নয়, মানে তোমার ওই দুর্লভ ঘটনা নয়, তবে হতে পারত। তুমি দীর্ঘদিন এসেছ—গিয়েছ—”

“তা গিয়েছি। কিন্তু আপনি জানেন, কোনদিন—মাত্র শেষের একদিন ছাড়া, যেদিন আপনি দেনাপাওনার কথা তুলেছিলেন, যেদিন আমরা তুমি তুমি হয়েছিলাম—সেই দিন ছাড়া—কোনদিন আপনাদের কাজে সাহায্য করা ভিন্ন অন্য কোনদিকে এক পা এগোই নি। তা ছাড়া, আপনি কেন আমার জন্য অধীর হচ্ছেন ? আমাকে ভুলে গিয়েছিলেন, ভুলেই যান। আমি সত্যিই মৃত।”

“তুমি প্রেত !”

“বলুন, রাগ করব না।”

“তুমি কেন ওদের প্রতারণা করলে ? ওই অপরূপ রূপসী বউটিকে পাবে বলে ?”

“হ্যাঁ, তাই।”

“কিন্তু ওর স্বামী যেদিন ফিরবে, সেদিন ?”

“সে বেঁচে নেই। আমার সামনেই সে মারা গেছে। আমার কোলের উপর।”

“তুমি স্কাউণ্ড্রেল। তুমি অতি হীন।”

“আপনি বুঝতে পারছেন না...”

“আমি আজই গিয়ে প্রকাশ করে দেব।”

"আপনি মিথ্যে উৎপীড়িত করবেন না নিজেকে মিস সেন। ও জানে।"

"জানে!" বিস্ময়ের আর অবধি রইল না আরতির। জানে! জেনেশুনে, পুরুষ আর পুরুষোত্তম নিয়ে ওই তত্ত্বকথাগুলি শুনিয়েছে সে! আশ্চর্য তো! না, আশ্চর্যই বা কিসের? যে-দেশে হরিনাম জপ করতে অপরকে ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধির উপায় চিন্তা করে, এক নিশ্বাসে মিথ্যা বলে, যে-দেশে ভগবানের মন্দিরের গায়ে অজস্র ব্যভিচারের চিত্রের অলঙ্করণ, যে-দেশে পরকীয়াসাধন ধর্মের অঙ্গ, সে-দেশের মেয়ে ওই ভটাচাজ-কন্যাটির পক্ষে এই বা অসম্ভব কিসের? কিন্তু, কিন্তু···

"কিন্তু, কিন্তু তুমি কেমন করে এই অনাচারে ডুবলে প্রবীর? তোমার জীবনের সে-শিক্ষাদীক্ষা?" কথা আর শেষ করতে পারলে না আরতি। নির্বাক প্রশ্নের নিষ্পলক দৃষ্টিকে প্রদীপ্ত করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তাতে কিন্তু বিব্রত হল না প্রবীর; মৃদু কণ্ঠে আস্তে আস্তে জবাব দিলে সে। বললে, "নিজে এই করার আগে আমার কোন বন্ধু এই কাজ করলে আমিও এই প্রশ্ন করতাম। কিন্তু নিজে যখন করলাম, তখন বুঝলাম। বুঝেই করেছি। যুদ্ধে গিয়ে রত্নেশ্বরকে দেখি। মেকানিক মিস্ত্রী, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটেই কাজ করত। আমার চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল, তবে সে দাড়ি-গোঁফ রেখেছিল, ঠিক ধরা যেত না কতটা মিল। মিলত গলার স্বরে আর চোখে। রঙ তার আমার থেকে ময়লাই ছিল। তবু মিল

ছিল। থাক সে-সব ছোট ছোট খুঁটিনাটির কথা। সে মারা গেল আমার কোলের উপর। মরবার সময় বললে তার মায়ের কথা, স্ত্রীর কথা। সে কী আকৃতি! আমরা তখন জাপানীদের কাছে হেরে বনে বনে পালাচ্ছি। সেই অবস্থায় কোন রকমে এসে পৌঁছুলাম বাংলা দেশে। কলকাতার কাছেই এদের বাস ছিল। নাম বলব না। যে-সব গ্রাম এখন শহর হয়ে উঠেছে, যেখানের ব্রাহ্মণদের এককালে বাংলাজোড়া গৌরব ছিল; এখন গৌরববিহীন ভিক্ষুকের মত অবস্থা, যাদের বংশধরেরা সেই অগৌরবের জ্বালায় ইংরিজি শিখতে গিয়ে কেউ অর্ধশিক্ষিত, কেউ শিক্ষিত হয়ে আমার আপনার মত নাস্তিক; সেখানে গিয়ে এদের পেলাম না। শুনলাম শাশুড়ী বউটিকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে, খেটে খায়। রাঁধুনী বা ঝিয়ের কাজ করে। ঠিকানা জোগাড় করে এলাম। বউ ও মা দুজনেই আমাকে ভুল করলে রত্নেশ্বর বলে। তখন আমার দাড়িগোঁফ হয়েছে; আমার অজ্ঞাতসারে আমি রত্নেশ্বর সেজেছি। সে-ঘটনা—"

চুপ করলে সে। হাসলে। কৌতুকের হাসি নয়, সে-হাসি সুখস্মৃতি স্মরণের হাসি, অথচ বিষণ্ণ।

আরতির ভালো লাগছিল না বিন্যাস করে কথা বলার এই ঢংটাকে। প্রবীর পাঁকে-গড়া মূর্তির উপর রং দিয়ে মনোরম করতে চাইছে। প্রবীর চুপ করতেই সে বলে উঠল, "তুমি বউটির রূপ দেখে আপনাকে হারালে। সুযোগ নিলে।"

"হ্যাঁ। কথা সংক্ষেপ করলে তাই দাঁড়ায়।"

"তারপর মেয়েটির যখন সর্বনাশ হয়ে গেল, আর অস্বীকারের

পথ রইল না, তখন তুমি হয়তো তাকে বললে যে, সে তুমি নও। ছি! ছি! তোমাকে ছি প্রবীর!"

"মানুষের একটা অবস্থা আছে; সে অবস্থায় সে যখন পৌঁছয়, তখন কোন ছি-ছিকারই তাকে স্পর্শ করে না মিস সেন।"

"তখন তার অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছয় সে। চামড়া হয় গণ্ডারের মত। পঙ্কপল্বলেই তখন তার বিলাস।"

"এরও প্রতিবাদ করব না আমি। কিন্তু শুধু একটি কথা বলব যে, মেয়েটি প্রথমে ভুল করলেও প্রথম রাত্রেই ভুল বুঝতে পেরেছিল। তাকে আমি ছুঁই নি, আমিও তাকে সব কথা খুলে বলেছিলাম। তখনও আমার চলে আসবার শক্তি ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পথ ছিল না। ওই আধপাগলা বুড়ী সারাটা রাত্রি বউ-বেটার ঘরের দরজা আগলে শুয়ে ছিল। আরও কিছু ছিল, কিন্তু সে থাক।"

"সে ওই বউটির অপরূপ রূপ!"

"না, তা ছাড়াও ছিল। সে থাক। কিন্তু বার বার রূপ-রূপ বলে যে-ভাবে কথা বলছেন, তাতে রূপকে যেন তুচ্ছ এবং ব্যঙ্গ করছেন আপনি। বলতে পারেন, যেখানে একজনের রূপকে একজনের চোখে ভাল লাগলে সে তার জন্যে পাগল হয়, সব বিসর্জন দেয়, সেখানে যে-রূপ বহুজনের চোখে অপরূপ মনে হয়, সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে যদি তার পূজা করেই থাকি, তবে কী দোষ করেছি আমি?" একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললে, "লোকে বলে; যেখানে বহুর মনো-হরণ-করা রূপ, সেখানে ভগবানের আভাস।"

হেসে উঠল আরতি ; বললে, “ভগবান ! শেষ পর্যন্ত ভগবান প্রবীর ? হায় ! হায় ! হায় !”

“ওঃ, আপনি ভগবান মানেন না !”

“না মানি। কিন্তু তুমি মানলেও ও নাম করবার অধিকারী তুমি নও।”

“মানতে পারলাম না। কারণ ভগবানই পাপপুণ্যের বিচার-বোধ! তা থাক। কিন্তু বলুন তো আমার অন্যায়টা কি ? পাপ কোথায় ?”

“এই প্রশ্ন তোমার জিভে আটকাচ্ছে না ?”

“না। ধরুন, মেয়েটি বিধবা হয়েছে। আমি যদি বিবাহ করতাম, তাতে আপত্তি থাকতে পারত ? অন্যায় হত আমার ?”

ভ্রূ কুঁচকে আরতি বললে, “তা তুমি কর নি।”

“না। কিন্তু তাকে নিয়ে আমি স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করি। আমাদের ঘরদোর দেখে এসেছেন। আমরা কীভাবে বাস করি, অন্তত সেখানে কোন ব্যভিচারের কোন নিদর্শন দেখেছেন কিনা বলুন !” একটু হেসে বলল, “এ যুগকে আমি জানি মিস সেন ; এ যুগের যেটা চরম মডার্নইজ্‌ম্ তাও জানি। ক্লাব-হোটেল দেখেছি। এ-যুগের অতি সৎ মডার্ন দম্পতিও দেখেছি। তাদেরও ডাইভোর্স দেখেছি। আমরা তাদের চেয়েও সৎ, শান্ত এবং সুখী। আমি দেবীর মত দেখি, সে আমাকে দেবতার মত দেখে। এবার বলুন, কোন অপরাধ আমাদের ?”

চুপ করে রইল আরতি। এই কথা যে বলতে পারে, তার

সঙ্গে তর্ক করে সে কী করবে? মাথার ভিতরটা কেমন করছে তার। ক্ষোভ পাক খাচ্ছে, শিখা নিভে-যাওয়া ধোঁয়ানো অগ্নিকুণ্ডের মত। সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণতার মত একটা অবসাদ। তারই মধ্যে একটা কথা মনে হল। ধীরে ধীরে মুখ তুলে সে বললে, "কিন্তু এইভাবে মিস্ত্রীর কাজ করে জীবনকে নীচের স্তরে নামিয়ে দিয়েছ কেন? তুমি যা বললে, যদি সত্যি হয়, তবে তুমি তোমার উপযুক্ত চাকরি করে ওকে উপরে তুলতে পারতে! মানুষ অন্ধকারে মুখ লুকোয় কখন—"

"সে তুমি বুঝতে পারবে না গো ঠাকরুণ।"

চমকে উঠল আরতি। প্রবীরও মুখ নামিয়ে বসে ছিল। সে মুখ তুলে একটু হেসে বললে, "তুমি কেন এলে রতি?"

রতি কখন এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। কাঁধে গামছা-কাপড়, হাতে একটি ঘটি। গঙ্গা-স্নানের অছিলা করে ওদের অনুসরণ করেছে।

রতি বললে, "থাকতে আর পারলাম না। সাপের মাথার মনিতে যখন কেউ হাত বাড়ায়—তখন সে জানতে পারে, আমিও জানতে পেরে ছুটে এসেছি। আমি তো চিনেছি এ কে। শোন, যা বললে তুমি, তার উত্তর শুনে বোঝা যায় না। তুমি তো বাবুঘরের মেয়ে গো। তোমাকে ভালবেসে কেউ তো ফকির হবে না। কোন কালেও তুমি বুঝবে না। তুমি নিজে যদি কোন ভিখিরীকে ভালবেসে তার পাশে দাঁড়িয়ে ভিখিরিনী হতে পার, তখন বুঝবে।" মেয়েটির চোখ দুটি জলজল করে যেন জলছে। গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে

এই জলন্ত দৃষ্টি নিয়ে এই অপরূপ রূপসী মেয়েটি যেন বহ্নিশিখার মত জ্বলছে।

আরতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু পারলে না। এই মুখরা মেয়ের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে পারবে না। সভাগৃহ হলে হত। এর মুখে তো কিছু আটকাবে না।

মেয়েটির মুখ আটকায় নি, সে আবার বললে, "ওকে তুমি এমন করে বোল না। ও আমার পুরুষোত্তমের দান, নারায়ণের আশীর্বাদ। যাও, তুমি বাড়ি যাও। আমার ঘরে আগুন জ্বালাতে এস না।"

"জ্বালাবার কিছু নেই।" এবার নিজেকে সম্বরণ করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘৃণাভরে বললে আরতি, "কী হবে জ্বেলে? যা পুড়ে গেছে, তা কি আর পোড়ে? ও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রবীর, তুমি অঙ্গার। না, তুমি প্রেত! তুমি প্রেত!"

সে আর দাঁড়াল না, পা বাড়ালে। ওদের দিকে ফিরে তাকালে না। শুধু শুনতে পেলে মেয়েটির কথা, "দাঁড়াও, চান করে নি। তুমিও চান কর না! ওই অকথা-কুকথাগুলো শুনলে।" অতি তিক্ত হাসি আরতির মুখে ফুটে উঠল।

গঙ্গার জলের পুণ্যে অশরীরী প্রেত মুক্তি পায় কি না, আরতি জানে না, কিন্তু জীবন্ত দেহধারী প্রেতের মুক্তি হয় না। তবে ডুবে মরলে স্বতন্ত্র কথা। প্রবীর ডুবুক বা না ডুবুক, তার স্মৃতি ডুবে যাক আজ, ভেসে যাক, সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যাক।

॥ আট ॥

সমস্ত জগত এবং জীবন এক মুহূর্তে তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। তার দৃষ্টিকে কিছু আকর্ষণ করলে না। কোন স্বর কোন শব্দে সে মুখ ফেরাল না, চকিত হল না; কোন গন্ধ সে অনুভব করলে না; পথে বস্তিটার পাশের সরু গলির মুখে একটা মরা বেড়াল পচে গন্ধ উঠছিল লোকজন নাকে কাপড় দিয়ে জায়গাটা পার হচ্ছিল কিন্তু আরতির কোন খেয়ালই হল না: খেয়াল হল গলিটা পার হয়ে এসে রাস্তার উপর উঠে; কই গাড়ি কই? গাড়িটা অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে! তার মনে প্রশ্নও জাগল না—সে পথ ভুল করেছে অথবা গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! সে খেয়াল দূরের কথা, গাড়িটা থেকে মুখ বের করে তাকে ডাকছিল সুধা বউদির বোনপো সুব্রত,—গাড়িটাও তাদের এবং সেই তার সঙ্গে এসেছে, তাতেও তার হুঁশ হয় নি—সে হেঁটেই চলেছিল। সুব্রত গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে কাছে এসে তাকে ডাকলে, "মাসীমা মাসীমা বলে ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না? গেলে এক পথ দিয়ে এলে এক পথ ধরে!"

আরতি অর্থহীন উত্তর দিলে, "হ্যাঁ।"

"বেশ মানুষ!"

"এ্যাঁ?"

আবার সুব্রত বললে, "কি হয়েছে মাসীমা?...মাসীমা!"

"চল শিগ্‌গির চল।"

"শরীরটা খারাপ করছে?"

বেঁচে গেল আরতি এতক্ষণে বললে, "হ্যাঁ।" বলে গাড়িতে চড়ে বসে এক কোণে হাতে মাথা রেখে বসে রইল। গাড়ির গতির প্রতি খেয়াল ছিল না পথের জনতার উপর না, পাশের বাড়ির উপর না; মাইক্রোফোনে কি একটা পুলিশ ঘোষণা হচ্ছে, তাও সে শুনতে পেলে না।...

বাড়িতে এসে সে-ই যে সে ঘরে এসে শুল—চার পাঁচ দিন উঠল না। সুধা বউদি বারবার এলেন—কিন্তু সে বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। বউদি তার স্বভাব-মত জোর করে শুনতেও চাইলে না। কয়েদিন পর সে উঠবার—বের হবার চেষ্টা করলে। বাইরের প্রচণ্ডবেগে আলোড়িত সংঘর্ষে সংঘাতে বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের জীবনাবর্তের মধ্যে নিজেকে কুটোর মধ্যে ফেলে দেবার চেষ্টা করলে। খবরের কাগজ টেনে নিয়ে বসল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আশ্চর্য সংগ্রাম চলছে। প্রস্তাব—প্রত্যাখ্যান —প্রতিপ্রস্তাব। বিবৃতির পর বিবৃতি! রাজনীতির ঘাতে প্রতিঘাতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষের সীমা পরিসীমা নেই। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের জীবনক্ষেত্রে আগুন জ্বলে গেছে। ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে কলকাতার আকাশ। সে আগুন ছড়াচ্ছে দূরে-দূরান্তে গ্রামাঞ্চলে। এর মধ্যে নিজেকে ফেলে দিলেই হল। কিন্তু কার বা কাদের সঙ্গে জড়াবে নিজেকে? অরুণকে মনে পড়ল। সারা-রাত্রি ভেবে সে আবার সে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। না। সে আর তা পারবে না। অরুণের সঙ্গে কোথায় একটা কি হয়ে গেছে, তার সঙ্গ ওর অসহ্য!

অরুণ নিজেও তার কাছে এসেছিল মাঝখানে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য নাটক লেখা হয়েছে, সেই নাটকে অভিনয় করতে হবে। আশ্চর্য স্বপ্নে বিভোর অরুণ। এমন ভাবে বললে যেন নাটকটা অভিনয় হয়ে গেলেই সব বিভেদ একেবারে বর্ষাশেষে শরতের আরম্ভে মেঘ কেটে যাওয়ার মত কেটে যাবে। কিন্তু সে বলেছে—'না।' তার এসব কিছু ভাল লাগছে না। ওই প্রবীরের প্রেত যেন তাকে ভূতগ্রস্তের মত অভিভূত করে পেয়ে বসেছে। সে—পারবে না। অরুণকে তার আরও খারাপ লাগছে। অরুণ তাকে কটূ কথা বলেই চলে গেছে। যাক।

পাতুদা—খুব সমারোহ করে সার্বজনীন পূজোর আয়োজনে মেতেছে। পাতুদাও বলেছিল—আমাদের আপিসের কাজ করে দে না। বসেই তো রয়েছিস।

মন্দ লাগল না প্রস্তাবটা। পাতুদা যাই হোক সার্বজনীন পূজোর কথা ভাল লাগল। কয়েকদিন কাজ করলে সে। কিন্তু কয়েকদিন পর তাও ভাল লাগল না।

কর্মীর দলের মধ্যে বিচিত্র সমাবেশ। রাস্তার রোয়াকের আড্ডাবাজ থেকে শিক্ষিত যুবক পর্যন্ত। মাঝে মাঝে আসে বর্তমান দুর্যোগে সমাজ সম্প্রদায়ের রক্ষী সেবার দল। বিচিত্র মনে হল আরতির। কিছুদিন আগেও এরা সমাজে অপাংক্তেয় ছিল। আজ আশ্চর্যভাবে এরা কাজ করছে। মারবার এবং মরবার জন্য প্রস্তুত। সময় সময় প্রশংসা করতে ইচ্ছে হয়—আবার সময় সময় ভয় করে। এই এদের জন্যেই প্রথমটা মন বেঁকে বসল। তারপর সেই সুযোগেই

বোধ হয় সেই বিষণ্ণ উদাসীনতা তাকে ব্যাধির পুনরাক্রমণের মতই অভিভূত করে ফেললে। সেই প্রবীরের প্রেত! তার উপর ক্ষোভকে সে সম্বরণ করতে পারছে না। অথচ না করলে সে বাঁচবে কি করে?

প্রথম দিন সে নিচে নামল না শরীর ভাল নেই বলে। দ্বিতীয় দিন বলে দিলে সে পারবে না। তার ভাল লাগছে না। কর্তব্য করবারও শক্তি বা প্রবৃত্তি নেই তার। পারবে না।

কয়েকদিন আগে সে পড়েছিল—'ক্ষণে মুহূর্তে চলমান পরিবর্তনশীল কালের সঙ্গে ধানমান ও পরিবর্তনশীল জীবনসত্তার গভীরে এক নিত্যকালের ও জীবনসত্তার অবস্থান আছে: তাই শাশ্বত। মনে মনে যদি কখনও অনুভব করে থাক—সকল জনের মধ্যেও তুমি একা, যাকে চেয়েছ তাকে পাও নি, সকল সম্পদের মধ্যে থেকেও তুমি রিক্ত অর্থাৎ ওর মধ্যে যা তুমি চাও তা তোমার নেই, তবে তখনই সেই নিত্যকাল ও সত্তাকে অনুভব করতে পারবে, আস্বাদন করতে পারবে। এই বিষণ্ণ বেদনার মধ্যে নীরবে নিঃশব্দে তুমি যদি ধ্যানমগ্ন হতে পার তবে সেই নিত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে, তার মধ্যেই পাবে অমৃত, তার মধ্যেই পাবে পরম সত্য। কারণ কোন কালেই কেউ তো যা চেয়েছে তা পায় নি, তাই বেদনাই তো চিরন্তন, সেই বেদনাতেই সকল মানুষে শেষ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গেছে।' বড় ভাল লাগল কথাগুলি।

ওই কথাকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরে সে পড়ে রইল। ওসব কাজ সে করতে পারবে না। কাজ সে করবে—এমন একটা কাজ

যে কাজে বেদনার সমুদ্রে ডুব দিতে হবে; যে কাজে হাত দিয়েই মনে হবে—জীবন ধন্য হয়ে গেল। যাতে সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে প্রবীরের অভাব আশ্চর্যভাবে কোন অগোচরে মিলিয়ে গেল।

এল, অকস্মাৎ সেই কাজের আহ্বান এল। খবরের কাগজটা খুলবামাত্র মনে হল—এই তো এই কাজই সে খুঁজছিল।

১০ই অক্টোবর নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায় কলকাতার আগুন গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এবং যে বীভৎস নৃশংসকাণ্ড সেখানে ঘটল তাতে কলকাতার দাঙ্গার নৃশংসতা ক্ষুদ্র বলে মনে হল, ম্লান হয়ে গেল। নোয়াখালি আর গোলাম সারোয়ার—ত্নটো নাম মানুষের কাছে এমন ভয়ংকর হয়ে উঠল যে, বিছানায় শুয়ে ওই নাম ত্নটো মনে করলে আর ঘুম আসে না। এই মানুষ! এই ধর্ম, এই সভ্যতা, এই শিক্ষা!

হে ভগবান! কোথায় ভগবান! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন কানে শোনা যায় কোন দূর থেকে ভেসে আসা ধর্ষিতা নারীর কান্না, ভেসে আসে মানুষের মৃত্যু-যন্ত্রণা, কাতর আর্তনাদ; চোখ বুজলে অন্ধকারের মধ্যে ভেসে ওঠে গ্রাম-জোড়া আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মানুষ বোবা হয়ে গেল মানুষের বর্বরতায়। রাজনৈতিক প্রগল্‌ভতা—আলাপ-আলোচনা স্তব্ধ হয়ে গেল।

এ নাকি কলকাতার ব্যর্থতার পরিপূরণ।

অকস্মাৎ এই স্তম্ভিত স্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটি কণ্ঠস্বর—শান্ত

দৃঢ় কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। দিল্লী থেকে ভেসে এল সে ধ্বনি—আমি বাংলায় যাব; ওই নোয়াখালি ত্রিপুরায় আমি যাব—আর্ত্ত পীড়িত মানুষকে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সাহস অবলম্বন করতে বলবার জন্য যাব; উগ্রতায় আক্রোশে আত্মসম্বিত-হারা আক্রমণকারীদের বলতে যাব—ক্ষান্ত হও, শান্ত হও, ঈশ্বরকে স্মরণ কর, মনুষ্যত্বে ফিরে এস। আমি জানি না বাংলায় আমি গিয়ে কি করতে পারব—তবে এইটুকু বলতে পারি যে, বাংলায় না গেলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।

আশ্চর্য কথা কয়েকটি। মন ভরে গেল আরতির। এই তো, এই তো কাজ। অগাধ বেদনায় মুহ্যমান স্পন্দনহীন মানুষের সেবা! ভয়-কাতর বায়ুস্তর ও ভয়ঙ্করতায় জর্জর রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে নিজের বুকের পাঁজরের টুকরো খসিয়ে আপনার মেদাবলেপন দিয়ে অভয়ের আলো জ্বালা। এই তো কাজ! হ্যাঁ। এই তো কাজ! প্রবীর সেই ভাস্বর আলোকবৃত্তের গণ্ডীর বাইরে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাক—মিলিয়ে যাক!

সারাটা দিন এই কথাই সে ভাবছিল। নীচেকার ঘরে পাতুদাদের বৈঠক চলছে, রক্ষীবাহিনী দল এসে জুটেছে, মাতব্বরেরা এসেছে, উত্তেজনার অন্ত নেই। প্রতিহিংসায় অধীর হয়ে উঠেছে সকলে। প্রতিহিংসা চাই। টাকা উঠছে, অস্ত্র সংগ্রহ চলছে, সকলের মুখ থমথম করছে; আজ সন্ধ্যা থেকে কলকাতায় প্রতিশোধ আগুন জ্বলবে; সারা কলকাতার সংবাদ আসছে—এখান থেকে এখানকার সংবাদ যাচ্ছে। শান্তি কমিটিগুলো পঙ্গু হয়ে গেছে।

গান্ধীর এই সংকল্প-বাণীর তীব্র প্রতিবাদ উঠছে। ওই গান্ধীই সব অনিষ্টের মূল। শান্তির জন্যে আসছেন! কে—না গান্ধী!

—গান্ধী ? না—। নামটা বিকৃত এবং উপহাসাস্পদে রূপ দিয়ে উচ্চারণ করতেন পাতুদা! জাত তুলে গাল দিয়ে বলতেন—বেণে কোথাকার!

এসব তার কানে এলেও সে উত্তেজিত হয় নি। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অহিংসার প্রতি কোনদিনই তার আকর্ষণ ছিল না। বরং বিপরীত মনোভাবই সে পোষণ করে এসেছে। অরুণ কঠিন সমালোচনা করত, সেগুলি তার যুক্তিসম্মতই মনে হয়েছে আগে। কিন্তু তার চরিত্র ও স্বভাবের মধ্যে মত-পার্থক্য সত্ত্বেও বিপরীত মতের শ্রদ্ধেয় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব কখনও ঘটে নি। এ নিয়ে অরুণের সঙ্গে তার বাদপ্রতিবাদ অনেকদিন হয়েছে। শুধু গান্ধীজী নয়, সুভাষচন্দ্রকে নিয়েও হয়েছে। সে কঠিন প্রতিবাদ করেছে। আজ তার মন অতীতকালের সকল দিনের মন থেকে আলাদা। দাঙ্গা থেকে এই পর্যন্ত কঠিন আঘাত ও দহনের মধ্য দিয়ে এসে যে নতুন মন পেয়েছে—সে মন অনুত্তেজিত, শান্ত; নিঃশেষিত শক্তি—অবসন্ন। সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। সে যেন বহুদিনের বা অতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় পড়ে আছে; নানা কণ্ঠের নানা কথা, আহ্বান এসে কানে ঢুকছে কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রী অসাড়; হঠাৎ কে এক অমৃতময় পুরুষ-কণ্ঠের শান্ত সুরের ওই ক'টি কথা তার কানে এসে পৌঁছুল—'আমি যাব, ওই প্রজ্বলিত বহ্নিদাহের মধ্যে আমি প্রবেশ করব, বহ্নিকে বলব

শান্ত হও ক্ষান্ত হও, অথবা আমাকে গ্রাস্ কর। দগ্ধ মানুষদের উদ্ধার করব, সেবা করব।'

তারই সঙ্গে অনুক্ত আহ্বান সে শুনতে পেলে, 'কেউ যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও, এস।' এ আহ্বানে সে বিচিত্র স্পন্দন অনুভব করলে। গল্পে যেমন শোনা যায়—মৃতকল্পের শিয়রে এসে মহাপুরুষ ডেকে বলেন, 'ফিরে এস জীবনে; সঞ্জীবিত হও, উঠে বস; সকল রোগ তোমার দূরে যাক।' আর অমনি রোগী চোখ মেলে প্রসন্ন হেসে ধীরে ধীরে উঠে বসে—ঠিক তেমনি। তেমনি ভাবেই সকল অবসাদ থেকে মুক্ত হয়ে সে উঠে বসল। যাবে—সে যাবে। সে ওই শান্তের সঙ্গে, ওই শুদ্ধের সঙ্গে, ওই করুণা-স্নিগ্ধ বেদনা কাতর মানুষটির সঙ্গে যাবে, ওই অগ্নিদাহের মধ্যে প্রবেশ করবে।

উঠে বসল বিছানার উপর। তারপর বিছানা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল জানালার সামনে।

দূরে বিস্ফোরণের শব্দ উঠছে। ওই কোণের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। ওই ধ্বনি উঠছে—'আল্লা হো আকবর; নারায়ে তকদীর।' ওই শোনা যাচ্ছে—'বন্দেমাতরম। জয়হিন্দ।'

পরদিন সকাল হতে না হতে সে ছুটল সুব্রতদের বাড়ি। গাড়িটা একবার চাই। কিন্তু গাড়িটা পেলে না, খারাপ হয়ে আছে। সে বাসে চেপেই ছুটল। বাগবাজার। বাগবাজারে কাঁটাপুকুরে শচীন মিত্রের বাড়ি।

প্রিয়-দর্শন সৌম্য শচীন্দ্রনাথ কাগজ পড়তে পড়তে কাঁদছিলেন।

চমকে উঠলেন আরতিকে দেখে।—"আপনি? আপনি তো আরতি সেন?"

"হ্যাঁ, আপনার কাছে প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।"

"প্রার্থনা? সে কি? বলুন।"

"মহাত্মাজী নোয়াখালি যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে যেতে চাই।"

"আপনি মহাত্মাজীর সঙ্গে যাবেন?" তাঁর কণ্ঠস্বরে সে কী বিস্ময়। বিস্ময় অহেতুক নয় সে কথা জানে আরতি। নাটকের প্রসঙ্গ তার মনে আছে। কিন্তু সে সঙ্কুচিত হল না, সে অসঙ্কোচে বললে, "আমার জীবনে বিপর্যয় ঘটে গেছে শচীনবাবু, আমি এই মহাযজ্ঞের প্রসাদ পেলে বাঁচব, নইলে আমি ডুবে যাব, হারিয়ে যাব। হয়তো মরতে হবে আমাকে!"

তার মুখের দিকে চেয়ে শচীনবাবু বললেন, "বসুন বসুন। তার জন্যে কি! যাবেন।"

"যাব?"

"যাবেন; আমি অনুমতি করিয়ে দেব।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সে অকস্মাৎ বলে উঠল, "আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আপনাকে আমি প্রণাম করব—শচীনবাবু?"

ব্যস্ত হয়ে শচীন মিত্র মিষ্ট হেসে বললেন, "ভগবানকে করুন। আমাকে না।"

৬ই নভেম্বর সকালে স্পেশ্যাল ছাড়ল। বেহারে ওদিকে দাঙ্গা লেগেছে কলকাতা এবং নোয়াখালির প্রতিক্রিয়ায়। কলকাতার

দাঙ্গায় হত আহত হিন্দুরা ফিরে গিয়ে বেহারে জ্বালিয়েছে আগুন। কলকাতা পর্যন্ত তার চিহ্ন এসেছে। বেহার হয়ে যেসব ট্রেণ এসেছে সেসব ট্রেণের কামরায় রক্তের চিহ্ন। কিন্তু এই আশ্চর্য মানুষটির একটি নির্দেশে বেহার শান্ত হয়েছে। বেহার যদি শান্ত না হয় তবে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। বেহারে ছুটে এসেছেন জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বেহারে দাঙ্গার গতি রুদ্ধ হয়েছে। পরম শান্ত পরম শুদ্ধ চলেছেন নোয়াখালি।

স্পেশ্যাল ভর্তি লোক। পথে স্টেশনে প্লাটফর্মে কাতারে কাতারে লোক। তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করছে একটি গানের কলি—

"শান্ত হে, মুক্ত হে, হে, অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য"!

অকস্মাৎ তাতে ছেদ পড়ে গেল।

ভিড়ের মধ্যে ও কে? ওই যে প্লাটফর্মের বাইরে কোলাপ্সিবল গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে? ও কে?

ড্রাইভার রতন। প্রবীরের প্রেত। সঙ্গে তার প্রেতিনী! প্রেত আঙুল দিয়ে মহাত্মাজীকে দেখাচ্ছে। মেয়েটি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তার মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বললে যা করেছ করেছ—তোমার বিচার ভগবান করবেন প্রবীর। আমি শুধু এইটুকু বলি—তুমি ওই রতনের প্রেতত্ব থেকে মুক্তি লাভ কর। ওই মেয়েটিকে পত্নীর মর্যাদা দিয়ে তুমি আবার প্রবীর হও। প্রেতত্ব থেকে মুক্তি লাভ কর।

না। জীবন্ত প্রেতের মুক্তি হয় না।

সংসারে যারা দেহনাশ করে আত্মহত্যা করে তাদের আত্মা প্রেতত্ব পায়—প্রেতলোকের অন্ধকারে বীভৎস রূপ নিয়ে অশান্ত অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা কালের অন্তে—অথবা উত্তরাধিকারীদের প্রেতশিলায় প্রায়শ্চিত্ত বিধানে এবং পিণ্ডদানে না কি তাদের প্রেতত্বের মোচন হয় তারা মুক্তিলাভ করে, শান্তি পায়, দিব্য দেহ পায়। কিন্তু সংসারে যারা চরিত্রনাশ করে আত্মহত্যা করে—তারা জীবন্ত প্রেত। একমাত্র দৈহিক মৃত্যু ছাড়া তাদের জগতের প্রেতত্ব এবং প্রেতলোক থেকে তাদের মুক্তি হয় না। কিন্তু দেহের প্রতি তাদের আশ্চর্য মমতা। প্রেত রতন ড্রাইভারের মুক্তি হয় নি। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল আরতির সঙ্গে গঙ্গার ধারে শ্মশান ঘাটে।

আশ্চর্য বিপরীত সংস্থান—। একদিকে আত্মদান করে মহান আত্মা চলেছেন অগ্নিশিখায় ভর করে—দিব্যলোকে। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ অশ্রুসজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে—অন্যদিকে এই প্রেত দাঁড়িয়ে আছে একটি চিতার পাশে। চোখে মুখে দীনতার ছাপ। আর ওই প্রেতিনীও দাঁড়িয়ে আছে পাশে! কিন্তু দেখেও সে ক্ষুব্ধ বিরক্ত হল না। নাঃ, অন্তরে তার আর জ্বালা নেই। সব যেন জুড়িয়ে গেছে।

প্রায় এক বৎসর পরের ঘটনা। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

এই এক বৎসরে তার জীবনের সকল গ্লানি সকল নালিশ মুছে গিয়ে শুভ্রতায় শুচিতায় আশ্চর্য আনন্দে ভরে গেছে। এক বৎসর সে কাটিয়েছে নোয়াখালিতে। নোয়াখালিতে ওই পরমাশ্চর্য মানুষটির সঙ্গে দুর্গতের দুঃখীর চোখের জল মোছাতে মোছাতে কখন যে তার নিজের জীবনের সকল দুঃখ সকল শোক আনন্দ-আলোকে পরিণত হয়েছে তা সে হিসেব নিকেশ করে দিন-তারিখ নির্ণয় করে দেখে নি কিন্তু ধীরে ধীরে তাই সে অনুভব করেছে প্রত্যক্ষভাবে। প্রথম প্রথম সে অন্ধকারের সুযোগে একটা বেদনায় কাঁদত। তার মধ্যে এই সুখ-দুঃখ দুইই ছিল। তারপর দুঃখ ছিল না। একটি বেদনাবিধুর বিষণ্ণ সুখ থাকত। তারপর শুধু আনন্দ। সে আশ্চর্য অবস্থা। মৃত্যুতে ভয় নেই, মৃত্যুভয় যারা দেখায় তাদের প্রতি বিদ্বেষ নেই, কারুর প্রতি ঘৃণা নেই, পরিশ্রমে ক্লান্তি আছে কিন্তু দুঃখবোধ নেই ; দেহে মনে সে এক অবস্থা! প্রথম দিকে মধ্যে মধ্যে প্রবীরের কথা মনে পড়েছে কিন্তু শেষের দিকে আর না।

সঙ্গে মেয়েরা আরও অনেকেই ছিলেন, নেতৃস্থানীয়া তাঁরা, তাঁদের মত ঠিক সে হতে পারে নি, কিন্তু তা নিয়েও তার কোন ক্ষোভ বা মনক্ষুণ্ণতা ছিল না। দু একজন রহস্য করে বলেছেন, "আরতি তুমি ভাই নিজেকে যেন বৈরাগ্যের সিম্বল করে তুলছ। এতো ভাল নয়।"

সে প্রসন্ন হেসে বলেছে, "দেখুন আমি যেবার প্রথম দার্জিলিং গিয়েছিলাম—সেবার এত গরম জামা চড়াতাম যে দার্জিলিংয়ের

সকল মানুষের মধ্যে আমার দিকেই লোকের চোখ পড়ত। আমিও আশ্চর্য হয়ে দেখতাম কেমন কত অল্প গরম জামাকাপড় পরে লোক চলাফেরা করছে। তারপর ম্যলে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে বসেই থাকতাম তো বসেই থাকতাম। লোকে আসত বসত দেখত গল্প করত ফটো তুলত, হাসত, আমি বোবা হয়ে বসেই থাকতাম। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতেন—'আপনি বোধ হয় অসুস্থ?' আমি বলতাম—'না। আমি নতুন।' মহাত্মাজীর এই সাধন ক্ষেত্র আমার কাছে নতুন। এখানে আপনারা চলাফেরা করছেন অনেকদিন, আমি নতুন এসেছি—প্রতিটি পা ফেলতে আমার ভয় হয় কোথায় কোন ভুল করে ফেলি।"

প্রশ্নকর্ত্রী বলেছিলেন, "তুমি চতুর।"

উত্তর দেয় নি আরতি।

কথাটা বাপুজীর কানেও উঠেছিল—বাপুজী তাকে একদিন ডেকে বলেছিলেন, "তোমার কি কোন দুঃখ আছে এখানে?"

সে বলেছিল; "না বাপুজী! এখানে আমার কোন দুঃখ নেই; বরং জীবনে যে দুঃখ ছিল সে আমার জুড়িয়ে আসছে। হয়তো জুড়িয়ে গেছে—তাই আমি এত ঠাণ্ডা!"

বাপুজী হেসে বলেছিলেন, "তবে নতুন দুঃখ কিছু সংগ্রহ করো। কিছু উত্তাপ প্রয়োজন জীবনে।"

সেদিন আবার মনে পড়েছিল প্রবীরের কথা। সব পুরানো কথাগুলি মনে পড়েছিল। প্রবীরের কথা। প্রেত রতনের কথা নয়।

তারপর থেকে ধীরে ধীরে সে সহজ হ'তে চেষ্টা করেছে কিন্তু

তা পারে নি। প্রেত এসে তার মনের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে তাকে সরাতে চেয়েও পারে নি!

কটা দিন সে তাকে যেন যখন তখন ভয় দেখিয়েছিল। আরতি কাজের মধ্যে বেশী করে মগ্ন করেছিল নিজেকে। কর্মই দিয়েছিল শক্তি; ওরই পুণ্যের প্রভাবে পাপ সরে গিয়েছিল।

ওঃ, সে কি কৃচ্ছ্রসাধন করেছিল সে! তার ফলেই ওই স্মৃতির উপরের কালো যবনিকা নিস্পন্দ স্থির হয়ে গিয়েছেন। নোয়াখালির সে দিনগুলি কী দিন! প্রখর গ্রীষ্মে সে যেন মরুভূমিতে দিন যাপন। ক্রমে ক্রমে সে উত্তাপ কমল এই মানুষটির শান্তিবারি সিঞ্চনে। সমগ্র ভারতবর্ষের তীর্থস্থান হয়ে উঠল নোয়াখালি। সর্বজনমান্য বরেণ্য মানুষেরা এল এখানে। ভারতবর্ষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের শেষ নির্দেশ যেতে লাগল নোয়াখালি থেকে। তারপর ২রা মার্চ গান্ধীজী গেলেন বিহার। সে থেকে গেল এখানে। থেকে গেল যাঁরা গান্ধীজীর কাজ শেষ করবার ভার নিলেন তাঁদের সঙ্গে। ফিরে এল অগাস্ট মাসে। সুধা বউদির টেলিগ্রাম পেয়ে এল। বউদি আর্তভাবে টেলিগ্রাম করেছিলেন, 'তুমি অবিলম্বে এস বড় বিপদ।' সুধা বউদির বিপদ? কি বিপদ?···অনুমান করতে পারে নি, তবু না এসেও পারলে না। অনুমান দু তিনটে করেছিল বই কি, কিন্তু মিলল না। অনুমান করেছিল মামা বোধ হয় মারা গেছেন, কিন্তু না, তাঁর কিছু হয় নি। এক আধ বার মনে হয়েছিল পাতুদা হয়তো ছোরাছুরি খেয়েছেন। অসম্ভব তো নয়। অথবা কঠিন রোগে পড়েছেন হয়তো, শেষ মুহূর্তে পাশে দাঁড়াবার জন্য তাকে

ডেকেছেন—কিন্তু না, তাও নয়। লাটুকে নিয়ে গোটা সংসারটা বিব্রত হয়েছে। লাটুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সে ওই রক্ষাবাহিনী নিয়ে একটা মুসলমান বস্তীতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

দেশকে কেটে হিন্দু মুসলমানকে পৃথক পৃথক অঞ্চলে ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে; ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হবে। বাংলা দেশ দু ভাগে বিভক্ত হবে, পূর্ববঙ্গ থেকে লাখে লাখে লোক চলে আসছে সব ফেলে দিয়ে, এখান থেকে মুসলমানেরা যাচ্ছে পূর্ববঙ্গে, তবে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের মত নয়। সম্পত্তি বিকিকিনি চলছে জলের দামে। এই সুযোগে একটা মুসলমান বস্তী কিনেছে লাটু—এখানে শ্যাডো মিনিষ্ট্রি গঠনের পরই। বস্তীটা থেকে অনেক মুসলমানই চলে গেছে পূর্ববঙ্গে, বাকী যে কজন ছিল তাদের তাড়াবার জন্য লাটু ওই রক্ষীবাহিনী নিয়ে গিয়ে বস্তীতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুলিশ লাটুকে গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত হয় নি, পাতুকেও এ্যারেস্ট করেছিল, সে জামিন পেয়েছে। সংসারে পাতুদারা বিচিত্র মানুষ। যত দুর্দান্ত তত ভীরু। যত কুটিল তত মূর্খ। যত দাম্ভিক তত নির্লজ্জ। পাতুদাই সুধা বউদিকে দিয়ে টেলিগ্রাম করিয়েছেন তাকে। আরতি আজ যখন গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসেছে, তাঁর স্নেহ পেয়েছে তখন তাকে সঙ্গে করে কর্তাদের কাছে গেলে একটা উপায় কি হবে না? বৃদ্ধ বাপ—আরতির মামাও বলেছেন, "তাই কর বউ মা, আরতিকেই টেলিগ্রাম কর।"

এ সবই প্রায় এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। পাতুদারা চিরকাল করিৎকর্মা লোক। আইন আদালত, আইনের ফাঁক ফাঁকি মারপ্যাঁচ—এসব আইন কর্তাদের চেয়েও অনেক বেশী জানেন এবং বোঝেন; শুধু তাই নয়, এমন শক্তি ধরেন যে সূচীপ্রবেশের ছিদ্রপথ পেলে সেই পথে অনায়াসে ঐরাবতে চড়ে পার হয়ে যেতে পারেন। পুরাণের মায়াবীদের মত যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আক্রমণ করতে পারেন আবার তাতে পরাজয় সম্ভাবনা দেখলে পরমুহূর্তে ভয়ঙ্কর মূর্তি থেকে অদৃশ্য হয়ে এক মনোহর মূর্তিতে মাল্য হাতে আত্মপ্রকাশ করে স্মিতহাস্যে সম্ভাষণ করে বলতে পারেন শত্রুকে—'এস মাল্য গ্রহণ কর।' তাই করেছেন পাতুদা; কেসটা প্রায় মিটেই গেছে। মুসলমানদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে পীস কমিটি করেছেন, মিষ্টান্ন খাইয়েছেন; কাপড়চোপড় তৈজসপত্র কিনে দিয়েছেন; পোড়া-ঘর তৈরী হতে আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপর মুসলমানরা বলেছে—'না-না-না; চিনতে আমাদের ভুল হয়েছে। সেই রাত্তিরের কাণ্ড, ভয়ে জান দুরদুর করছে; চোখ যেন দিশা দিশা লেগেছিল; লাটুর মতন বটে তবে লাটুবাবু না। উঁহু! উনি না।'

এতেই নিশ্চিন্ত হয় নি পাতুদা। সুধা বউদি বললেন, "শুধু এই না কি! ওরা এই করেছে আর রক্ষীবাহিনীর সেই ন্যাড়া সে রাত্রে না কি স্টেন গান নিয়ে সেখানে গিয়ে বলে এসেছে যে, আমাদের কি লাটুবাবুর নাম করলে শেষ করে দিয়ে যাব এই দিয়ে। তারপর তোর নাম নিয়েও কংগ্রেসীদের কাছে গিয়ে বলেছে, 'ভেবে দেখুন

আরতি আমার আপন পিসতুতো বোন, সে ছেলেবেলা থেকে ছিল প্রগ্রেসিভ, দাঙ্গার পর আমাদের এখানে এসেই তার চেঞ্জ হয়েছে। কি হয়েছে সে জানেন আপনারা। সে নোয়াখালিতেই রয়ে গেছে; গান্ধীজীর মাহাত্ম্য সে আমাদের এখানেই বুঝেছে। আমরা এসব হিংসার কাজ করতে পারি না।' পাড়ার লোকেরা অবিশ্যি সায় পেড়েছে। সায় দেয় নি অরুণ শুধু। সেই এক ছেলে আরতি। লোকেরা তো ওদের ওপর খড়্গ-হস্ত। পাড়ার ছেলেরা দেখলে টিটকিরি মারে; তবুও সব জায়গায় আছে, সব তাতেই আপনা থেকে এগিয়ে গিয়ে নাক গলিয়ে ঝগড়া করবে। মাঝখানে কারা গায়ে মাথায় গোবরের জল ঢেলে দিয়েছে, তাতেও লজ্জা নেই— একভাবে চলছে। মা-মা! সেদিন হন হন করে হেঁটে চলেছে, মাথায় তেল নেই, মুখে এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি জামাটা ছেঁড়া, —আমি গাড়ি থামিয়ে ডেকে বললাম, কোথায় যাবি—এ কি চেহারা?' উত্তর দিলে না, চলে গেল। অঃই—অঃই স্বয়ং এসেছেন মহাপ্রভু তোর দাদা—এখন জিজ্ঞেস কর।"

পাতুদা ফিরলেন কোথা থেকে। খুব ব্যস্ত। যেন পৃথিবীর চিন্তা ভর করেছে। আরতিকে দেখে পরম সমাদর করে বললেন, "ওরে বাপ্ রে আরতি বুড়ী! কখন? চা খেয়েছিস?"

হেসে আরতি বললে, "চা খাই নি আজ আট মাস। নোয়াখালি গিয়ে থেকেই।"

"তাই বটে। তা তুই ভাই দেখালি বটে। ওঃ। মহাত্মার সঙ্গে নোয়াখালি। বাপরে বাপরে!...পথে কোন কষ্ট হয় নি!"

"না।"

"তারপর সব শুনেছিস? তা আমি সব চুকিয়ে ফেলেছি। দেখ আমি ভেবে দেখলাম, বুঝলাম—যে এ ছাড়া পথ নেই। ওই মহাত্মার পথ কংগ্রেসের পথই একমাত্র পথ। তুই যখন নোয়াখালি যাস তখন খুব চটেছিলাম আমি। কিন্তু তুই ঠিক করেছিস। The only way. আমি কংগ্রেসের মেম্বার হব। তুই ভাই যখন এসেছিস তখন আর কুছ পরোয়া করি না আমি। তুই একটু বলে দিবি।"

অবাক হয়ে গেল আরতি।

পাতুদা বললে, "তোর একটা কাজ করে রেখেছি আমি। কপালিটোলার বাড়ি সব ক্লীয়ার করে তালা দিয়ে এসেছি। জানালা দু চারটে খুলে নিয়েছে নিচের তলার, উপরটা ঠিক আছে। বলিস তো ভাড়া দিয়ে দি। এখন ডিমাণ্ড খুব।"

আরতি বললে, "না। আমি নিজেই থাকব ওখানে। এখানেই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দেখব তারপর নোয়াখালি ফিরব—যদি সম্ভবপর হয়।"

সম্ভবপর হওয়া কঠিন সে বুঝে এসেছে আরতি। এখানেই সে বরং কাজ বেছে নেবে। বাপুজী আসছেন কলকাতা। স্বাধীনতা দিবসে তিনি দিল্লীতে থাকবেন না, কলকাতায় থাকবেন তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সে গিয়ে শেয়ালদহে ওই বাস্তুহারাদের সেবায় লাগবে।

হঠাৎ এরই মধ্যে ঘটে গেল একটা বিপর্যয়। অকল্পিত আকস্মিক।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনে হিন্দু মুসলমানে সে কী মিলনের উৎসাহ আনন্দ। নাখোদা মসজিদে হিন্দুদের সে কী সমাদর। প্রাণখোলা আলিঙ্গন। স্বয়ং গান্ধীজী বেলেঘাটায় পীড়িত মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান করছেন। মনে হল দুর্যোগের অবসান হল বুঝি। কিন্তু আশ্চর্য, কোথায় লুকিয়েছিল অবিশ্বাসের পাপ—তার সঙ্গেই থাকে হিংসার সাপ—হঠাৎ তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আবার দপ করে জ্বলে উঠল দাঙ্গার আগুন। মহাত্মাজী অনশনব্রত ধারণ করলেন। আত্মহুতি দিয়ে এ আগুন নেভাবেন। কিন্তু তার আগেই তিনটি মহাপ্রাণ নিজেদের আহুতি দিয়ে বললেন—'শান্তিরস্তু'। শান্তি হোক। শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে আহত হলেন—শচীন মিত্র, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল দাশগুপ্ত।

আরতি বসেছিল মহাত্মাজীর পদপ্রান্তে ঘরের এক কোণে; তার মনে হল অন্ধকার হয়ে গেল সব। শচীনদা আহত হয়েছেন! বাঁচবার আশা নেই!—তাকে এই পথের সিংহদ্বার খুলে প্রবেশপত্র দিয়েছিলেন শচীনদা—সেই শচীনদা নেই!...

আর্তস্বরে অন্তরে অন্তরে সে ভগবানকে ডেকে বলেছিল—'হে ভগবান, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। বাংলার মহাপ্রাণ পুষ্পটিকে অকালে ঝরিয়ে দিও না।'

সে ছুটে এল বাগবাজার।

বাগবাজার থেকে শবযাত্রা শ্মশানে এল। পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন আচার্য কৃপালনী। সে দেখেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন। একটি লোকোত্তর বিষণ্ণ মহিমার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে

ছিল সে। হঠাৎ সে আচ্ছন্নতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এ কি বিস্ময়!

শ্মশানের ওদিকে দাঁড়িয়ে প্রবীর। ওপাশে সেই বধূটি। কার শব নামানো রয়েছে।

শচীনদার শবযাত্রার সঙ্গে শ্মশানে এসেছিল শেষ প্রণাম জানাতে, আর ইচ্ছে ছিল একটু ছাই সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে। শ্মশানে এসে ওপাশে তাকিয়ে সে চমকে উঠল।

ড্রাইভার রতন—প্রবীরের প্রেত, আর সেই প্রেতিনী। একটা চিতার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে! মুহূর্তের জন্য সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি দেখতে হল তাকে, এই পবিত্রক্ষণে ওই ওদের না দেখলেই যেন ভাল হত। মুখ ফিরিয়ে নিলে সে। তাকালে শচীন মিত্রের চিতার দিকে। কিন্তু কী বিচিত্র সন্নিবেশ! একদিকে মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ, অন্যদিকে জীবন্ত প্রেত। তার মুক্তি নেই, মুক্তি নেই! হতমান হতশ্রী—মূঢ় অপাংক্তেয় জীবন্ত প্রেত!

এদিকে চিতার আয়োজন হচ্ছে। শ্মশানঘাটে জীবনের ঢেউ এসে লেগেছে। লোকারণ্য। ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। কুসুমাস্তীর্ণ করে দিচ্ছে ইহলোক থেকে লোকান্তরে যাবার পথ। ওই পথে যাবে মহাযাত্রী!

মুখ ফিরিয়ে কিন্তু থাকতে পারলে না সে।

না। আজ তার আর ঘৃণা নেই। বিদ্বেষ নেই। করুণাই হচ্ছে। শ্মশানে এসেছে কেন? কি হল? বধূটিও এসেছে। তবে? মুখ ফিরিয়ে দেখলে আবার।

ও! প্রবীরের নকল-মা যাচ্ছেন। খাটের ওপাশে মুখখানা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ সেই বৃদ্ধাই বটে। হতভাগী। জানতে পারলে না তার সন্তান সেজে এক প্রেত তার জীবনের স্নেহের পরমান্ন আহার করে গেল!

কিন্তু প্রবীর এমন করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ক্লান্ত শ্রান্ত ভাবলেশহীন মুখ। সব যেন ফুরিয়ে গেছে।

বউটি দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। নিস্পলক চোখ। মনে হচ্ছে যেন ভরা গঙ্গার স্রোতের উপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে কোথায় যেন চলে গেছে—বা যেতে চাচ্ছে। নদীর মোহনা—সেই সাগরসঙ্গম পর্যন্ত! সে দৃষ্টি না দেখলে কল্পনা করা যায় না। ওঃ বড় আঘাত পেয়েছে ওরা দুজনে। ওই বুড়ীই বোধ করি এই দুজনকে এক করে বেঁধে এই পাপ করিয়েছে। সে তো শুনেছে, সে জানে—মানুষ বুড়ো হওয়ার সঙ্গে কেমন করে চতুর হয়, ধর্মের ভান করে অধর্ম করতে শেখে, কেমন করে কন্যা বিক্রী করে, বধূকে পাপ করায় অর্থের জন্য।

না—আজ আর ও চিন্তা থাক। শচীন মিত্রের চিতার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললে, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করবার মত বল দাও। আজ এই মুহূর্তে যেন ওদের ঘৃণা না করি।'

পাড়ার লোকজনেই—রতন ড্রাইভারের সঙ্গীরা—চিতা সাজাচ্ছে। প্রবীরের যেন চিন্তার অবধি নেই। কিসের এত চিন্তা?

শবটিকে চিতায় চাপানো হল।

এদিকে জয়ধ্বনি উঠছে। জীবনের জয়গান। তারই মধ্যে

দাঁড়িয়ে ওই পরাজিত পতিত আত্মার প্রতি মমতা সহৃদয়তা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। প্রবীর কি আজ অনুতপ্ত? অথবা বিব্রত? বউটি এগিয়ে আসছে। হাতে মুখাগ্নির আগুন তুলে নিচ্ছে। প্রবীর সেই চোখ বুজে দাঁড়িয়ে। অত্যন্ত চিন্তাকুল মনে হচ্ছে। বধূটিই বা এভাবে দাঁড়িয়ে কেন?

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আরতি এগিয়ে গেল। যেন এরপর আর থাকতে পারলে না। যে-অধঃপতনেই পতিত হয়ে থাক, একদিন উপকার সে অনেক করেছে। বলেছিল, 'আপনার ভেবে করেছি, আপনার ভেবে নিতে পারলে মনে ও-কথা উঠবে না মিস সেন!' কিন্তু আপনার তো হয় নি! আজ যদি কিছু উপকারেও লাগতে পারে, কিছু যদি শোধ হয়, হোক। তার ব্যাগে কুড়িটা টাকা আছে।

এগিয়ে গিয়ে সে কাছে দাঁড়াল। প্রবীর তাতেও চোখ খুললে না। সে ডাকল, "শো—"! সংশোধন করে ডাকলে, "শুনুন!"

প্রবীর চোখ মেলে চেয়ে একটু যেন চকিত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, "আপনি! শচীনবাবুর শেষ যাত্রায় এসেছেন? ওঃ, মহাপ্রাণ চলে গেলেন!"

সে-কথার উত্তর দিলে না আরতি। বললে, "উনি, মানে বউটির শাশুড়ী মারা গেলেন?"

"হ্যাঁ।"

এ-অবস্থায় কথা বলা বড় কঠিন। চুপ করে থেকে মনে গুছিয়ে নিয়ে আরতি বললে, "একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না!"

"না, বলুন। যা বলবেন, আমি মাথা পেতে নেব।"

"না, সে-সব কোন কথা আমি তুলব না। তোমার স্মৃতি, তার জন্যে ক্ষোভ দুঃখ আমি মুছে ফেলেছি। তা ছাড়া আজ আমি মহৎ আশ্রয় পেয়েছি—"

"আমি জানি, মহাত্মার সঙ্গে আপনি নোয়াখালি গিয়েছিলেন। সেদিন বেলেঘাটা যাচ্ছিলেন, তাও দেখেছি।"

"ও কথা নয়। আমি আজকের কথা বলছি। আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, আপনি চোখ বুজে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে আছেন। এসে অবধিই দেখলাম।"

"হ্যাঁ। আজ কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে। সে-সব শুনে আপনি কী করবেন মিস সেন?" একটু হাসলে সে।

আবারও মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে আরতি বললে, "শ্মশানে দাঁড়িয়ে চিন্তা—মানে উনি আপনার মা হলে কিছু বলতাম না।" আরও একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "কোন দরকার যদি থাকে, টাকাকড়ি—"

"না। ধন্যবাদ আপনাকে দেব না। সে সব কিছু দরকার নেই। এ অন্য কথা।" হেসে চুপ করলে সে। হঠাৎ তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একটু শঙ্কিত ভাবেই ডাকলে, "রতি! অত ঝুঁকো না।"

রতি—সেই বধূটি মুখাগ্নি সেরে গঙ্গার কিনারায় আল্‌সের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রতি বললে, "ভয় নেই। আর রতি কেন? সতী বলো।" তারপর হঠাৎ ঘুরে বললে, "তুমিও আগুন দাও না এইবার। যে অবান্ধবা বান্ধবা বা যে অন্য জন্মনি বান্ধবাঃ—আমি

মন্তর বলে দিচ্ছি, বল—।" সে আরতিকে দেখেও দেখলে না। আশ্চর্য মেয়ে! ও-মেয়েরা বোধ হয় এমনিই হয়। ওদিকে তখন জয়ধ্বনি উঠেছে। কে গান ধরেছে, 'জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম।'

প্রবীরের যাত্রার সময় যেন ওই দ্বিতীয় চরণটি কেউ গেয়ে দেয়।

॥ দশ ॥

'আরতি দেবী...'

একখানা চিঠি। প্রথমে মিস সেন লিখে কেটে লিখেছে আরতি দেবী! প্রবীরের চিঠি!

দুদিন পর সে চিঠিখানা পেলে। মোটা খামের চিঠি। গান্ধীজীর অনশনভঙ্গের পর বেলেঘাটা থেকে বাড়ি ফিরে এসে চিঠিখানা পেলে। তার নিজের কপালিটোলার বাড়িতে। বাড়িতে এসে কেউ দিয়ে গিয়েছে। বাড়িতে তখন সে প্রায় একা। থাকবার মধ্যে সুধা বউদিরা দিয়েছেন একজন গুর্খা দারোয়ান। আর সে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে তার পুরনো ভাড়াটে এক ঘর। তারা মা আর ছেলে। দাঙ্গায় কেমন করে বেঁচেছিল জানে না। মা বেঁচেছিল আরতি জানে; আরতির সঙ্গেই বাগবাজার গিয়েছিল একসঙ্গে—এক লরীতে। ছেলেটি ১৬ই আগস্ট কাজে বেরিয়ে আর ফিরতে পারে নি। পারে নি বলেই বোধ হয় বেঁচে গিয়েছিল। তারপর কেমন করে লাকে পেয়েছিল আরতি জানে না, তবে আরতি এ বাড়িতে আসতে তারা এসে বলেছিল—'আমরা ফিরে

আসতে চাই।' আরতি না বলে নি। ছেলেটি ভদ্র। নোয়াখালিতে আরতি যখন ছিল তখন সে তাকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল—'আপনার এই আশ্চর্য পরিবর্তনের জন্য আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি। আপনার বাড়িতে যখন গান্ধীজী নেতাজীর সম্পর্কে কটূক্তি করে আলোচনা হত তখন শুনে দুঃখ পেতাম।'

ভাল লেগেছিল আরতির। তাই তারা আসতে সে খুশী হয়েছিল।

চিঠিখানা পত্রবাহক ছেলেটির হাতেই দিয়ে গিয়েছিল। সে বলল, "আপনি বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ, বোধ হয় পাঁচ মিনিট পর। মোটর-মিস্ত্রী একজন।" চিঠির এদিকে প্রবীরের নামও লেখা আছে। প্রবীর চ্যাটার্জি। বিস্মিত হল আরতি—আবার ভুরুও কোঁচকাল তার। কী? কেন? ফেলে দেবে? না! খুললে সে চিঠিখানা। উপরে লেখা, "চিঠিখানা পড়বেন। আমার জন্য দুঃখ অনুভব করেছেন, সেই সৌভাগ্যের দাবিতে অনুরোধ করছি।" নীচে কালির দাগ চিহ্নিত করে সর্বাগ্রে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রথমে 'মিস সেন' লিখে কেটে 'আরতি দেবী' সম্বোধন করেছে!

"আরতি দেবী!

"আজ আবার আমি প্রবীর।

"জীবনের বিচিত্র দুশ্ছেদ্য বন্ধন কাল ছিঁড়েছে। এ-বন্ধন আপনি ছেঁড়ার আগে আমার নিজের ছেঁড়ার উপায় ছিল না। এবং এ বন্ধনের সম্পর্কে কোন কথা বলবারও অধিকার ছিল না। সংসারে

এমন অবস্থাও হয় আরতি দেবী, যখন মিথ্যাই হয় সত্যের চেয়েও বড়। আমার তা-ই হয়েছিল। সেদিন যে কথাটা বলতে গিয়েও বলি নি, এবং এই বউটি এসে পড়েছিল—সেই কথাটাই বলি আগে। আপনি আমাকে এতো ধিক্কার দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ওকে বিধবা বিবাহ করলে না কেন?' উপায় ছিল না আরতি দেবী। নইলে, আপনি তো আমাকে জানতেন, বিধবা বিবাহে আমার কোন সংস্কারের বাধা কোন কালে ছিল না। এমন কি, বিবাহ না করেও ওকে নিয়ে যদি আমার শিক্ষাদীক্ষা মত চাকরি করতাম, তাতেই বা আমার কে কী করত? প্রবৃত্তিই যদি হয় এবং লজ্জা বা সামাজিক সংস্কার না থাকে, তবে কিসের বাধা? বর্তমানে সমাজে রাষ্ট্রে উচ্চপদস্থ যারা এবং অতি মডার্ন যারা, তাদের তো এ চাঁদের কলঙ্কের মত। জানি না স্বাধীন ভারতবর্ষে কী হবে। আমার চাকরি ছিল ইংরেজ রাজত্বে, যুদ্ধবিভাগের। আপনি মডার্ন লাইফের অনেক জানেন, অনেক দেখেছেন, কিন্তু যুদ্ধবিভাগের এলাকায় ইংরেজ আমলে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রমোদ আপনি দেখেন নি। প্রমোদ কেন, তাদের সংসার-জীবনও জানেন না। থাক সে-কথা। আমি আমার বিচিত্র অবস্থার কথা বলছিলাম। যে-অবস্থায় মিথ্যাই বড় হয়ে উঠল, সত্য মাথা তুলে প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারলে না। হার মানলে। আমার সত্য ইচ্ছে করে হার মেনেছিল বলেই আমি মিথ্যেকেই মাথায় তুলে নিয়েছিলাম—এবং তার জন্যে কোনদিন কারুর কাছে লজ্জিত হই নি—আপনার কাছেও হই নি। সে নিশ্চয়ই আপনার মনে রয়েছে। আমার

নিজের কাছেও হই নি। তাই পেরেছিলাম আপনার সে-দিনের কথাগুলি সহ্য করতে, আপনার কাছে মুখ তুলতে এবং এই মিস্ত্রী-জীবনের মধ্যেও সুখী হতে। ওই বস্তীতে বাস করেও দুঃখ পাই নি, মিস্ত্রী সেজে ওই খাটুনি খেটে অসুবিধে বোধ করি নি। না—ভূমিকা থাক এইখানেই, যা জানাতে চাই তা-ই বলি।

"সেদিন কিছুটা বলেছি। বিবরণটা তার আগে থেকেই শুরু করি। যেদিন আপনার সঙ্গে আমার 'তুমি' বলার দোর খুলেছিল, সেই দিন থেকে শুরু করি। সাইক্লোনের দিন। এ এক বিচিত্র কাহিনী আরতি দেবী।

"আমি যখন পুনা আমেদাবাদ এবং উত্তর ভারত ঘুরে এলাম, তখন আমার মনে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। জীবনে বাইরের জগতের আঘাতে যা ঘটে, আজ নিজের মনের অবস্থানুযায়ী প্রতিক্রিয়ায় তার পরিবর্তন মানুষ ঘটিয়ে নেয়। ইংরেজের রাজকর্মচারীর ছেলে রাজকর্মচারীর ভাই, নিজে যুদ্ধ বিভাগে চাকরি নিতে গেছি আমি, আমার মনে উত্তর ভারতের আগস্ট আন্দোলন একটা আশ্চর্য ভাবান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল। এরা যা করেছিল, এবং তার প্রতিকারে ইংরেজ তার লালমুখো গোরাদের ছেড়ে দিয়ে যা করিয়েছিল, তাতে মনের মধ্যে আমার যা হওয়া উচিত তা-ই হয়েছিল। তাই সেদিন লঘুভাবে কী একটা কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম, এ-দেশের লোক এমনভাবে লড়াই দিতে পারে এ কি কেউ জানত? সুভাষচন্দ্র বিদেশে গিয়ে সামরিক অধিনায়কের পোশাক পরে আর্মির স্যালুট নিতে পারেন, এ কি

তিনিই জানতেন ? আপনি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে কটু কথা বলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। মনে পড়বে বোধ হয়। আমার মনটা খুঁত-খুঁত করেছিল। তখন আমিও আমার মনকে বুঝি নি। তার পরদিনই চলে গিয়েছিলাম চাকরির তলব পেয়ে। ট্রেনিংএর জন্য ঘুরতে হল কয়েকটা সামরিক কেন্দ্রে। ইংরেজ অফিসারের গাল শুনলাম। মনটা আরও বিষিয়ে গেল। মনে মনে শপথ নিলাম। মনে পড়ে গেল রথীনদার কথা। আপনার দাদা। আপনারা জানতেন না, রথীনদা ছিলেন গোপনে গোপনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুগামী। রীতিমত তাঁর দলের সভ্য ছিলেন। আমাদের কলেজে তিনিই ছিলেন ওই দলের প্রতিভূ। তিনি যেদিন লণ্ডনে এয়ার-রেডে মারা গিয়েছিলেন, সেদিন বোধ হয় বাড়িটা হিট হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সৈনিকের মত বিপুল উত্তেজনায় উৎসাহে দাঁড়িয়েছিলেন, খাড়া হয়ে দেখেছিলেন লণ্ডন রেড। কোন শেল্টারে মাথা গুঁজে দিয়ে বসে বা শুয়ে থাকেন নি। কলেজে তিনি বলতেন, 'এ ছাড়া আমাদের পথ নেই। অন্তত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার পথ নেই। মানুষ হলে আজ হোক কাল হোক, এই পথে দাঁড়াতেই হবে।' তাই আমার কল্পনায় রথীনদা সেদিন ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কলেজে রথীনদার অনুগামী ছিলাম না। এসবে বিশ্বাসও করতাম না। কিন্তু চাকরী নিয়ে—আমি সেটা অনুভব করলাম। সেই অনুভূতি নিয়েই ফ্রন্টে যাওয়ার পথে কলকাতায় নেমে দেখা করতে গেলাম আপনার সঙ্গে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, আপনিও আপনার বেদনার তাড়নায় একটা পথে নেমে গিয়েছেন। একদল সঙ্গিনী এবং কয়েকজন

সঙ্গীর সঙ্গে আপনি সমিতি খুলে কাজে মেতেছেন। মত ভাল বা মন্দ, সে-কথা নয়। মত—সব মতই ভাল। ভাল ভিন্ন মত হয় না আরতি দেবী। ভালতে যাওয়ার পথ ভাল-মন্দ হয় এবং সেই পথ বাছা নিয়ে সংসারে তর্ক বাধে, শেষ পর্যন্ত বিরোধ হয়। সেই তর্ক সেই বিরোধ অনুভব করেছিলাম সেদিন, সেই মুহূর্তে। তাই সেদিন যা বলতে গিয়েছিলাম, তা বলতে পারি নি; চলে এসেছিলাম। যা বলতে গিয়েছিলাম, সে-কথার আর আজ পুনরুক্তি করব না, করার অধিকার নেই; তবে আপনার তা মনে আছে. আমি চিঠিতে লিখেছিলাম। সে-দিন গঙ্গার ধারে চিঠির কথা আপনি তুলেছিলেন। আমিও ইঙ্গিতে ওই জবাবই দিয়েছিলাম। বলতে গিয়েছিলাম—কিন্তু বলি নি। যাক।

"ফ্রণ্টে চলে গেলাম স্পেশাল ট্রেনে। ইস্টার্ন ফ্রণ্টে, আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে। সেখানেই পেলাম এই রতনকে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারস্ ইউনিটে। সে পদবীতে জমাদার, কাজে মিস্ত্রী। আমি তার গ্রুপের ক্যাপ্টেন। দাড়িগোঁফ চুলওয়ালা ভটচাজ বংশের ছেলে। ধর্ম বংশ অনেক দোহাই পেড়ে সে দাড়িগোঁফ বজায় রেখেছিল। লোকটি অদ্ভুত নিপুণ মেকানিক। বিশেষ করে মোটর-যন্ত্র-বিত্থায়। মোটর বিকল হলে একটু নেড়েচেড়েই ধরে দিত কোথায় কী হয়েছে। ঠিক যেন পুরনো কালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নাড়ী দেখে রোগ নির্ণয়ের মত। আর তেমনি ছিল জেদী। আর ছিল আমার মত ক্যাট্‌স্-আই। রঙেও সাদৃশ্য ছিল, তবে তার ছিল তামাটে; আর গলাও ছিল আমার মত ভারী।

আমাদের ইউনিটের কর্তা একজন ইংরেজ, সে মধ্যে মধ্যে বলত, 'ও তোমার কেউ হয় ?'

"বলেছিলাম, 'না।'

"সে বলেছিল, 'আশ্চর্য তো !'

"একদিন তাঁবুতে মদ খেতে খেতে বলেছিল, 'চ্যাটার্জি, তোমার বাবা তো হাই অফিসিয়েল ছিলেন ? সত্যি না ?'

"বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।'

" 'তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয় আয়া ছিল !'

" 'হ্যাঁ। তবে আয়া নয়, ঝি বলি আমরা মেড-সারভেণ্টকে'।

" 'ওই জমাদার ভট্টাচারিয়ার মা নিশ্চয় তোমাদের বাড়িতে মেডসারভেণ্ট ছিল। বোধ হয় তোমার মনে নেই। নিশ্চয় তোমার জন্মের আগে। কারণ ও তোমার থেকে বয়েসে বড় হবে।'

"আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কী উত্তর দেব ভেবে পাই নি। কোমরের রিভলভারটা যেন নিজেই নড়ে উঠেছিল। কিন্তু মিলিটারি ডিসিপ্লিন, হাত দিতে পারি নি। শুধু উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। মুখ বোধ হয় লাল হয়েছিল। লক্ষ্য করে বলেছিল, 'আই নো চ্যাটার্জি, তোমাদের এ-দেশের সব জানি আমি। আমার গ্র্যাণ্ডপা এখানে প্ল্যাণ্টার ছিল, তার তিনটে আয়া ছিল—য়্যাণ্ড—আই নো।'

"আমি প্রতিবাদ জানিয়ে চলে এসেছিলাম। নাকী আওয়াজে একদল ইংরেজ কথা কয় শুনেছেন ? লোকটা সেই নাকী আওয়াজে তবুও বলেছিল, 'আঁই নোঁ, আঁই নো ইয়োর ইণ্ডিয়া।'

"তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

"আসামের অরণ্যভূমে তখন সন্ধ্যা নামছে। সূর্য অস্ত গিয়েছে। অরণ্যের আশ্রয়ে অন্ধকার বিচিত্র গাম্ভীর্যে থমথম করে। সেদিনের থমথমানি আমার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে অজস্র ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মধ্যে কোন একটা রাত্রিচর পাখি সন্ধ্যায় প্রথম পাখসাট মেরে পাখা মেলেছিল এবং অত্যন্ত কর্কশস্বরে ডেকে উঠেছিল। আমি ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, যে-কোন উপায়ে হোক এ রেজিমেণ্ট থেকে ট্রান্‌স্‌ফার আমাকে নিতেই হবে।

"নিজের তাঁবুর দিকে আসছিলাম। নিজের বুটের শব্দে বুঝতে পারছিলাম, আমি আজ হত্যা করতে পারি। পথের পাশে সাধারণ কর্মীদের ছাউনি। তারই একটা থেকে রতনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। সে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করছে। ভারী গলার আওয়াজ সন্ধ্যার অন্ধকারে কাঁসরের শব্দের মত মনে হচ্ছিল। চণ্ডী আবৃত্তি করছিল। খানিকটা আগে কয়েকটা ভারী যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। দিনেরবেলা ওগুলো দৈত্যের মত কাজ করত। মাটি পাথর কেটে চষে এগিয়ে চলত একশোটা কি হাজারটা বুনো শুয়োর বা মোষের মত। পথ তৈরি হচ্ছিল। আমরা পথ কেটে চলি আগে আগে। যান্ত্রিক বাহিনী যাবার জন্য পথ। ছাউনি থেকে দু-মাইল আগে কাজ হচ্ছিল। জনমানবহীন পাহাড় এবং বন চারিদিকে। শোনা যাচ্ছিল, শত্রুবাহিনী খুব দূরে নয়, দশ-বিশ মাইলের মধ্যেই। মনে হয়েছিল, আজই রাত্রে যদি তারা হানা দেয় তো বড় ভাল হয়। অন্তত বন্দী হয়ে মুক্তি পাই। তখন

নেতাজী এসেছেন, পূর্ব দিগন্তের রণাঙ্গনে নতুন সাড়া জেগেছে। বনভূমে উদয়-মুহূর্তের সূর্যরশ্মির একটা দুটো বাঁকা রেখার মত সে সংবাদ আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু খুব অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের ও-নাম মুখে আনার উপায় ছিল না। তবে ওরা নিজেরা মধ্যে মধ্যে নেতাজীকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করত। তা থেকেই বুঝতাম, সংবাদ সত্য। সেদিন মনে হয়েছিল, বন্দী হলে নেতাজীর সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নেব। বলব, 'আমার রক্ত আমি দেব, প্রাণ দেব, আমায় স্বাধীনতা দাও তুমি, আমার মনুষ্যত্বের মর্যাদা আমাকে দাও।'

"এরই মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলাম রতনলালের ঘরে। রতনলালের সদ্য স্তব পাঠ শেষ হয়েছে তখন। আমাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সৈনিকের অভিবাদন জানিয়ে বলেছিল, 'ইয়েস স্যার!'

"সেই দিন আলাপ করেছিলাম ভাল করে। কলকাতার কাছাকাছি একটি পণ্ডিতপ্রধান গ্রামের পণ্ডিত-বংশের ছেলে। এক-দিন মর্যাদা ছিল। আজ মর্যাদা গিয়েছে। তাই নতুন পথ ধরেছে। অন্ন চাই, মর্যাদা চাই, ঘর চাই। ইংরিজী পড়তে শুরু করেছিল, ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি। শেষে মেকানিক হয়েছে; বেশী উপার্জনের জন্য যুদ্ধে এসেছে। ঘরে মা আছে, স্ত্রী আছে। মায়ের একমাত্র সন্তান। মা কিছুতেই আসতে দেবে না, সে জোর করে এসেছে। বলেছিল, 'বলুন না, অবস্থা ফেরাবার এমন সুযোগ ছাড়তে আছে?' কথায়-কথায় বলেছিল, 'জীবনে ধিক্কার হত। আমার স্ত্রী পরমা সুন্দরী। রাজরাণী হবার উপযুক্ত। আমার

হাতে পড়ে সে হয়েছে ঘুঁটে-কুড়ুনী। সত্যিই ঘুঁটে দিতে হয়। ফিরে গিয়ে বাড়ির অবস্থা ফেরাব। একটা মোটর মেরামতের কারখানা করব। খুব চলবে। মাকে বললাম, তুমি খুশী হয়ে ছেড়ে দাও, আর আশীর্বাদ কর, আমি অক্ষত দেহে ফিরে আসব। মা আমার সাক্ষাৎ সতী। তিনি আশীর্বাদ করেছেন, আমি যদি সতী হই তবে তোর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। আমি ব্রত করলাম। যতদিন না ফিরবি এই ডান হাতে জপ ছাড়া কিছু করব না। বিছানায় শোব না। তেল মাখব না। হবিষ্যি করব। আর তিন হাজার দুর্গামন্ত্র জপ করব। তা-ই করছেন তিনি।' [illegible]ব শেষে বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে অনেকদিন[illegible]ক ইচ্ছে স্যার। আপনার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে। [illegible]নের ঘর তো, হয়তো খুঁজলে দু-তিন পুরুষের মধ্যে রক্তের মিল পাওয়া যাবে।'

"পত্র দীর্ঘ হচ্চে আরতি দেবী। সংক্ষেপ করতে হবে। রাত্রে বসে পত্র লিখছি। কাগজও বেশী নেই। আপনারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। সকাল হলেই বের হতে হবে রতনের জীবনের পালা শেষ করতে। তাই একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনায় আসি। আমি রতন হলাম কী করে? কেন? ১৯৪৪ সন, মার্চ মাস। ওদিকে জাপানীদের পিছনে রেখে আই-এন-এ আজাদ-হিন্দ্ এগিয়ে আসছে। ইংরেজ হটছে। বাতাসে সুরের রেশ যেন শুনতাম, 'কদম কদম বাঢ়ায়ে যা, খুশিকে গীত গাহে যে।' খুব কড়াকড়িতে গোপন রেখেছিল ইংরেজ আই-এন-এর খবর। তবু কানাকানিতে খবর পেতাম। মুখ খোলার

উপায় ছিল না। মিলিটারি বিভাগের সব চেয়ে বড় শিক্ষা, চোখে দেখো, কানে শুনো, মুখ খুলো না! মুখ মৎ খুলো।

"আমরা পিছিয়ে চলছি। হটছি। পালাচ্ছি। সম্মান বজায় রাখতে ইংরেজ অফিসারেরা বলছে, স্কিলফুল রিট্রিট!

"মাথার উপর গুরুগুরু শব্দ উঠল। শক্রবিমান। খান তিনেক। দেখতে দেখতে ছোঁ দিয়ে নেমে এল। তারপর সে এক ভয়াবহ পরিণাম। কলকাতার এয়ার-রেডের অভিজ্ঞতা থেকে এ কল্পনা করা যায় না। পায়রার ঝাঁকের উপর বাজপাখির ছোঁ মারা দেখেছেন? মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ঠিক তা-ই হল। কোন্ দিকে কে কোথায় গেল, পড়ল, লুকোল, কেউ বলতে পারে না। প্লেন কখানা চলে যেতে না যেতে আশে পাশে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে। আমি বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ রতন ডাকলে, 'স্যার!' একখানা জীপ পেয়েছে রতন। 'উঠে পড়ুন।'

"পিছনে দেখি অজ্ঞান হয়ে আছে আমাদের ইউনিটের কম্যাণ্ডিং অফিসার।

"রতনের হাতে জীপ। সে ছুটল এঁকেবেঁকে; বনের ভিতর দিয়ে, খানা ডিঙিয়ে, চড়াই ভেঙে চলল। পিছনে রাইফেল মেশিন-গানের শব্দ উঠছে। বনভূমে তার প্রতিধ্বনি বাজছে পাহাড়ে পাহাড়ে। চিৎকার উঠেছে। আঃ, আমি যদি সেদিন অপেক্ষা করতাম। কিন্তু ওই সময়টায় মানুষের স্নায়ু ঠিক থাকে না।

"হঠাৎ এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড়াল। রতন বললে, 'জলদি নামুন।' সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে রতন টেনে ইংরেজ অফিস'র-টাকে নামালে। তার তখন জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু সম্বিত ফেরে নি। আমিও লাফ দিয়ে নামলাম।

"ব্রেক ফেঁসে গেছে। ভাগ্যক্রমে একটা পাথরে আটকে গেছে সামনের চাকা। তার সামনে ঢাল। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারে নি রতন! হেডলাইট জ্বালতে সাহস করে নি। আলোর সন্ধান খুঁজতে হয় না। আলো নিজেই সন্ধান দেয়। শত্রুর দৃষ্টি গাছের মাথায় জেগে থাকে।

"রতন বলেছিল, 'হাঁটুন। এগিয়ে চলুন।'

"অন্ধকার নামছিল অরণ্যে। আমরা তিনটি মানুষ। শত্রুর হাত থেকে পালাচ্ছি। আমার মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছিল, পালাব না, অপেক্ষা করবে, ধরা পড়ব। আই-এন-এতে যোগ দেব। কিন্তু ইচ্ছাটাকে কার্যকরী করবার মত অবকাশ পাচ্ছিলাম না, পা দুটো ওদের সঙ্গেই চলেছিল।

"ইংরেজটি জীপ থেকে ছটকে পড়ে আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল; রতন জীপ চালিয়ে আসবার পথে দেখে তুলে নিয়েছিল; লোকটা চোট খেয়েছিল পিঠে। হাঁটতে পারছিল না। রতন এক জায়গায় বলেছিল, 'তাহলে এখানটাতেই রাত্রের মত বিশ্রাম করুন।' সামনে একটা ঝরণা। বন খানিকটা ফাঁকা সেখানটায়। ইংরেজটির সঙ্গে ছিল মদের ফ্লাস্ক, জলের বোতল, লোকটার সঙ্গে খাবারও ছিল পিঠের ব্যাগে। আমাদের রিট্রিটের পথেই আক্রমণ

হয়েছিল ; পালাবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি রাখে নি, কিন্তু জীপ উল্টে সে-সব গিয়েও সঙ্গের সরঞ্জাম কম ছিল না। লোকটা একাই খেতে শুরু করেছিল বসে বসে। আমিও বের করে খেতে গিয়ে সংকোচ বোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, 'রতন!'

"রতন হেসে বলেছিল, 'আমার একটু পূজো আছে।' তার ব্যাগ থেকে কী সব বের করতে আরম্ভ করেছিল। চলে গিয়েছিল ঝরণার ধারে। সামনেই কয়েক গজ মাত্র। সিগারেট-লাইটার জ্বেলে ঘোরাতেই বুঝলাম, আরতি করছে।

"ইংরেজটা চিৎকার করেছিল, 'বাতি নেভাও।'

" 'নেভাচ্ছি। এখানে কেউ দেখতে পাবে না।'

" 'নো-নো।' লোকটা উঠে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'ইউ ট্রেটার!' চমকে উঠে আমিও ছুটে গেলাম। দেখলাম কালী-মূর্তির আরতি করছে রতন, পাশে ব্যাগ থেকে বের করা আরও ছবি রাখা রয়েছে। সে-ছবি গান্ধীজীর!

"লোকটা ছুটে গিয়েছিল। রতনের গলা ধরে ফেলে অসুরের মত বুকে বসে ঘুষির পর ঘুষি মারতে আরম্ভ করেছিল এবং শেষে রিভলভার বের করে ধরেছিল, 'উইল শুট ইউ—ইউ ডগ!'

"আমার হাতে তখন রিভলভার উঠেছে! গুলি আমি করে-ছিলাম স্থির লক্ষ্যে। একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। একটু। দুটো গুলি, এক মুহূর্তের আগে-পিছে বেরিয়ে গেল। আমারটা আগে, ওর হাতেরটা পরে। ওর ট্রিগারের হাতটা যে টান শুরু করেছিল, সেটা আহত হলেও প্রায় আপনা আপনি কাজ করেছিল। শুধু

নড়ে গিয়েছিল। বুকে না লেগে লেগেছিল হাতের উপরে কাঁধে।

"মিলিটারি আইনে অপরাধী হয়ে গেলাম। রতন মরে নি। কিন্তু মরলেই ভাল হত। ওকে নিয়ে সেই অবস্থাতেই হাঁটতে শুরু করেছিলাম। ওঃ, সে কী অবস্থা! ভীষণ অরণ্যে পর্বতে একজন আহতকে নিয়ে আমি একা। তিন দিনের দিন রতনের হাত ফুলল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জ্বর। এই দুদিন শুধু সে বলেছিল তার বউয়ের কথা, মায়ের কথা। মা আর বউ। বউ আর মা। তাদের ফটো বের করে শতসহস্র বার দেখিয়েছিল। তিন দিনের দিন আর চলবার ক্ষমতা ছিল না তার, আমারও বইবার ক্ষমতা ছিল না। সেদিন চলায় ক্ষান্ত দিয়ে তাকে একটা গাছতলায় শুইয়ে আমি ছুটেছিলাম জলের জন্যে। সামনেই জল। জলের কাছে গিয়ে থাকতে পারি নি, শরীরের জ্বালায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ রতনের চিৎকারে ছুটে চমকে উঠলাম। কী হল? ছুটে গেলাম। গিয়ে শিউরে উঠলাম। রতনকে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েতে ছেঁকে ধরেছে। এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে এলাম। রতনের চোখ দুটো ভর্তি হয়ে গেছে পিঁপড়েতে। খেয়ে নিচ্ছে কুরে কুরে। রতন চিৎকার করছে, 'মা—মা—মা!'

"আমি আর থাকতে পারলাম না। আমার রিভলভারটা তুলে নিয়ে গুলি করে তাকে মুক্তি দিলাম। তারপর ছুটে পালালাম। কিছুদূর এসে ফিরলাম। ফিরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম আমার ব্যাগটা। সঙ্গে সঙ্গে ওরটাও নিলাম।

"কলকাতায় এলাম ভিক্ষুকের বেশে। ভিক্ষাবৃত্তি করেই। পায়ে হেঁটে, বিনা টিকিটে রেলে চড়ে। তখন দাড়িগোঁফ গজিয়েছে। মনে অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণা রতনের জন্য বড় ভালমানুষ! আর কানে বাজছিল তার কথা, মা আর বউ! বউ আর মা! গুলি খেয়ে আহত হয়ে একদিন আমাকে বলেছিল, 'যদি মরে যাই, তবে যেন খবরটা তাদের দেবেন।' তারপরেই বলেছিল, 'আমি মরব না। আমার মা কালীমায়ের কাছে হাত বাঁধা দিয়ে হবিষ্যি করে মাটিতে শুয়ে ব্রত করে আছে। বলেছে, আমি যদি সতী হই, তবে তোর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। তা—।' হেসে বলেছিল, 'যুদ্ধে একটা গুলি কাঁধে লাগা, এ কি একটা বেশী কিছু? মায়ের ব্রতের পুণ্য যদি মিথ্যে হবে, তবে বুকে লাগানো নলের গুলিটা কাঁধে এসে লাগবে কেন?'

"কলকাতায় ফিরতে লেগেছিল কয়েক মাস। সন্তর্পণে ফিরছিলাম। দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘিরছিলাম। ইংরেজটাকে মেরে কোর্ট মার্শালের ভয় ছিল, কিন্তু বেদনা ছিল না। রতনকে মেরেছি স্বীকার করে ফাঁসি যেতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু অন্তর্জ্বালার শেষ ছিল না। গৌহাটি কামাখ্যা পাহাড়ে সন্ন্যাসী সেজে ছিলাম কিছুদিন। শেষে কলকাতায় এলাম। আপনার কাছে যাই নি। ইচ্ছে হয় নি। আপনাকে যাদের সঙ্গে দেখে গিয়েছিলাম, আপনার মন এবং মত যা জেনে গিয়াছিলাম, তাতে মন বারবার বলেছিল, না, কাজ নেই। আপনারও ভাল লাগবে না, আমারও না! আর এই দীর্ঘ দেড় বছর আপনার মন আমার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে?

আপনার পাশের সমারোহ তো দেখে গিয়াছিলাম। কী করব স্থির করি নি, তবে রতনের মা-বউয়ের খোঁজ করে তাদের কোন রকমে খবরটা দিয়ে যা-হয় করব ভেবেই গিয়েছিলাম ওদের সন্ধানে। আপনাকে বলেছি, ওরা তখন গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছে। শুনেছিলাম, বাগবাজার অঞ্চলে আছে। পাচিকাবৃত্তি করে। দু-একজন বলেছিল, রূপসী বউটাকে ভাঙিয়ে খায়!

"কলকাতায় ফিরে খুঁজে ফিরছিলাম। তখনও আশ্রয় নিই নি কোথাও। ঠিক করতেও পারি নি কিছু। তখনও ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজ অফিসার হত্যার অপরাধ মাথার উপর! ওই লোকটাকে মেরে বন্দুকের গুলিতে বা ফাঁসির দড়িতে মরবার ইচ্ছে আমার ছিল না। এর অনুকূলে যে-ন্যায়শাস্ত্র যে-কথাই বলুক, তার বিরুদ্ধে ছিল আমার সর্ব অন্তরের বিদ্রোহ।

"তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়। বাগবাজারের ঘাটে শনি-সত্যনারায়ণের পূজা হচ্ছিল। নিতান্তই ব্যর্থ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একটি বধূ এসে সামনে দাঁড়াল। বড় বড় চোখ, সে যেন জ্বলজ্বল করছে। মুখ, দেহ, এমন কি সারা অবয়বের মধ্যে আছে ওই আশ্চর্য দুটি চোখ, আর ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ক্লান্তি এবং মালিন্যের ছাপ-পড়া দেহবর্ণ। অন্যথায় শুধু কঙ্কাল! যেন যক্ষ্মার রোগী। আর বুঝতে পারা যাচ্ছিল, ঘোমটায় ঢাকা আছে একরাশি চুল। মুখের দিকে তাকাল, অসঙ্কোচে; নির্ভয়ে। তারপর চলে গিয়ে ফিরে এল এক বৃদ্ধার হাত ধরে। আমায় বললে, 'নাও—তোমার মা নাও। আমার ছুটি!' এবার চকিতে চিনলাম, রতনের

বউয়ের ফটো আমার কাছে তখন, চিনলাম, এই তো রতনের বউ!

"রতনের মা চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মুখে হাত বুলিয়ে কেঁদে উঠল, 'হে শনি-সত্যনারায়ণ, একবার আমার চোখ দুটি ফিরে দাও। একবার! হে শনি-সত্যনারায়ণ!'

"বউটি তিরস্কার করে বললে, 'একবার মা বলে ডাক। চোখে চিনতে পারছেন না, ডাক শুনে চিনুন।'

"সমস্ত পূজার্থীরা সবিস্ময়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ডাক শুনবে বলে! রতনের মা তখন বলছেন, 'আমি বলেছিলাম, আমি যদি সতী হয়—তবে—'

"আমি আর থাকতে পারলাম না, 'মা-মা, ও-সব কথা এখানে থাক মা!

"বুকে জড়িয়ে ধরে রতনের মা বললে, 'চোখে না দেখলেও সেই তোর ডাক শুনে বুক জুড়িয়ে গেল। জুড়িয়ে গেল।'

"মিথ্যের প্রথম বাঁধন পড়ে গেল আরতি দেবী!

"সঙ্গে সঙ্গে বউটি যা করলে, তা কেউ কল্পনা করতে পারে না। ছুটে গিয়ে গঙ্গায় নেমে স্নান করে এলোচুলে দেবতাকে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমাকে কেউ একখানা ক্ষুর দাও গো, নয়তো ছুরি। আমার বুক চিরে রক্ত মানত আছে, পাঁচ টাকার মিষ্টান্ন মানত আছে, আজ আমার টাকা নেই, মিষ্টান্ন তো পারব না, কিন্তু বুকের রক্ত না দিলে যে আমার প্রত্যবায় হবে। একখানা ক্ষুর দাও গো।'

"এ-দেশ বিচিত্র! এল ক্ষুর। অভাব হল না। আশ্চর্য, হাঁটু

গেড়ে বসে মেয়েটি ক্ষুর দিয়ে বুকটা চিরে দিলে খানিকটা! রক্ত গড়িয়ে বেরিয়ে এল। ছোট একটা বাটি কেউ যেন নিয়ে এসে ধরল। কে যেন পাঁচ টাকার থেকে বেশী টাকার মিষ্টি এনে নামিয়ে দিলে। শাঁখ বাজল। উলু পড়ল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

"বাসায় এলাম।

"একখানা অতি জীর্ণ খোলার চাল, ছিটে বেড়ার দেওয়ালের ঘর, বাসা। সামনে তেমনি ছোট বারান্দা। আশেপাশে—এক-একখানা ঘরে এক-একটি পরিবার। তার উপর বৃদ্ধার তপস্যায় যুদ্ধ থেকে বেঁচে হারানো ছেলে ফিরে এসেছে, এই পুণ্যকাহিনী শুনে লোকের ভিড়! সেদিন তাদের ব্যঙ্গ করতে পারি নি। মনে মনেও পারি নি। লোকগুলির প্রায় সকলেই কেঁদেছিল।

"বুড়ী আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। গুণগান করেছিল বংশপুণ্যের, গুণগান করেছিল দেবতার, অহঙ্কার করেছিল নিজের তপস্যার, নিজের সতীত্বের।

" 'কার সাধ্যি? যমের সাধ্যি দূরের কথা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ক্ষমতা ছিল না, সতীর বাছার প্রাণ নেয়। মহাশক্তি সতীর চরণ ধরে, আমি সতী বসে আছি যে!' প্রায় পাগলের মত হাসতে শুরু করেছিল।—হা-হা-হা-হা।

"আমি ডুবে যাচ্ছিলাম অথৈ জলে। এই সময় বাসিন্দাদের একজন আগন্তুকদের বলেছিল, 'এইবার একবার যাও বাপু। এতদিন পর হারানিধি এল; ওদের কথা কইতে দাও। যাও যাও সব।'

"কে যেন বলেছিল, 'ওলো, বউয়ের চুল-টুল বেঁধে দে। ভাল করে সাজিয়ে দে বাপু।'

" 'সাজাতে হয় না। যে রূপ!'

" 'রূপের কী রেখেছে? না খেয়ে-খেয়ে শুকিয়ে-শুকিয়ে নিজের রূপকে দেহকে পুড়িয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করে!'

" 'দিয়েই বেঁচেছে মা। নইলে কি আর পাপের ছোঁ থেকে রেহাই পেত?'

"কে যে কোন ঘর থেকে বলছিল, জানি না। তবে কানে এসে ঢুকছিল।

"বুড়ী বলেছিল, 'হ্যাঁ বউ, আজ তুই রাত্রে ভাত খা।'

" 'খাবে বৈ কি। সোয়ামীর পাতে খাবে! মাছ আছে তো? না-থাকে তো যাও না কেউ, নিয়ে এস! আজকের খরচ সবারই!'

"খেয়ে দেয়ে শুতে হয়েছিল। মনোরম করে পাতা শয্যা। আমার মনে হয়েছিল মৃত্যুশয্যা। হ্যাঁ, ওই শব্দটি ছাড়া আর কোন কথা হতে পারে, বলুন?

"মিলিটারি অফিসার আমি, দিল্লীর কনট সার্কাস থেকে লাল-কেল্লা পর্যন্ত এলাকার প্রমোদ-জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছি আমি; ইতিহাসের ওই সব গল্প এক সময় সংগ্রহ করে পড়েছি। আগ্রা কেল্লায় বাদশাদের জীবন্ত নারীকে ঘুঁটি সাজিয়ে সতরঞ্জ খেলার ছক দেখে আপসোস করেছি—কেন বাদশা হয়ে জন্মাই নি!

এখানকার হোটেল-জীবনও দেখেছি। নিজেকে অপাপবিদ্ধ বলব না। এখান থেকে শেষবার অর্থাৎ যেদিন আপনাকে কথা বলতে এসে ফিরে চলে গিয়েছিলাম, তারপর ফ্রন্টের পথে শিলংয়ে কয়েকদিন থাকার সময় একটা এ্যাংলো-বার্মিজ বা এ্যাংলো-খাসিয়া মেয়ে, ওয়াকী, নাম লনা, সে আমার উপর ঝুঁকেছিল। জীবনটা তখন মদের নেশার প্রভাবে চলেছে। ফ্রণ্টে যাচ্ছি। জীবনের উপমা ফানুসের সঙ্গে, কখন ফেটে যাবে। সুতরাং তাকে রঙিন করে নাও। অফিসার্‌স মেস থেকে পালিয়ে তার সঙ্গে পাইন বনের তলায় চন্দ্রালোকিত রাত্রের প্রথম প্রহর যাপন করেছি। অসৎ আমি নই, কিন্তু কড়া নীতিবাদীর সৎ-ও আমি ছিলাম না। সেদিন মন এইভাবেই তৈরী ছিল যে, মিসেস চ্যাটার্জি যিনি হবেন, তাঁকে অন্য অফিসারের সঙ্গে নাচতে হবে, শেরি খেতে হবে। যাক, তবু সেদিন ওই বস্তীর ঘরে পাতা ওই শয্যা থেকে মৃত্যু-শয্যার বিভীষিকা মনে জেগে উঠেছিল। মনে মনে ভগবানকে ডেকেছিলাম, 'রক্ষা কর, তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

"ওই বধূটি নিজে হাতে পাতলে বিছানা। এরই মধ্যে সে আবার সাবান মেখে গা ধুয়েছে। মুখে স্নো মেখেছে, চুলেও সাবান দিয়েছে। কেন জানেন? এতটুকু দুর্গন্ধ পাছে আমাকে পীড়িত করে, তাই। অথচ আমি তখন নোংরা কাপড়ে-চোপড়ে শুধু ভিক্ষুক। স্বল্প আলো সে-বাড়িতে; কেরোসিনের ডিবে আর হ্যারিকেন। সেই আলোতে মনে হয়েছিল, সেই মলিনা মেয়েটা যেন মেঘ কাটিয়ে সন্ধ্যা বা ভোরের ভেনাসের মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

আমি কেন জানি না, কাঁপছিলাম। মনে হয়েছিল, কোথাও গিয়ে একটু মদ খেয়ে আসব। কিন্তু তাও পারি নি। মন চায় নি। পরিবেশের প্রভাব যে মানুষের চরিত্র এমনভাবে পাল্টে দেয়, এ-কথা এমনভাবে কখনও অনুভব করি নি। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের চেহারা দেখেছি। ভাল-মন্দ দুইই দেখেছি। কিন্তু এ-ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সে এমন শান্ত, এমন শুচি! ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইড-এর হাইডও বোধ করি এ-পরিবেশে বিব্রত হত। বাঁশের পাতার মত ভিতরে-ভিতরে কাঁপছিলাম। নিজের দুর্বলতার জন্য নয়; এ-মেয়ের এমন রূপ সত্ত্বেও একে নিয়ে ব্যভিচারের কামনা আমার জাগে নি। সব মানুষের মধ্যেই পশু আছে, আমার পশুটা যেন ঘুমপাড়ানী কাঠির স্পর্শে হতচেতন হয়ে গভীর শান্ত নিদ্রায় পড়েছিল আমার মমতা এবং সততার পদপ্রান্তে। তবু আমি কাঁপছিলাম কেন জানেন? কাঁপছিলাম, একে আমি বলব কী করে, 'আমি সে নই, তোমার ভুল হয়েছে, তোমার দৃষ্টি ভুল, তোমার আনন্দ ভুল, তোমার বুক চিরে রক্ত দেওয়া ভুল, এই সজ্জা ভুল, এই শয্যা রচনা ভুল, সব ভুল, সব ভুল!' কী করে বলব? কী করে বলব, 'রতনের মায়ের অহঙ্কৃত বাক্যগুলি মিথ্যা, তার এতদিনের এই তপস্যা মিথ্যা, তোমারও তাই। বিশ্বাস, তপস্যা, ধ্যান-ধারণা, সব মিথ্যা!'

"ভগবানকে আজ আমি বিশ্বাস করি। আপনিও করেন। বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভগবান-বিশ্বাসী—যিনি ভগবানকে না দেখুন, প্রত্যক্ষভাবে জানেন—তাঁর সাহচর্যে আপনি ধন্য, তাঁর স্পর্শ আপনি লাভ করেন। রামধুন গানও করেন। আরতি দেবী,

তাই অসংকোচে বলছি যে, ভগবানই সেদিন রক্ষা করেছিলেন; আমার কথাটা তিনিই তাকে বলে দিয়েছিলেন।

"রাত্রে আমি মড়ার মতই চোখ বুজে পড়ে ছিলাম। অন্য পথ তো ছিল না। লিখতে ভুলেছি, তার আগে ভিক্ষুকের বেশ ছাড়িয়ে আমাকে নতুন ধোলাই-পেটা কাপড়-জামায় রাজবেশ পরিয়েছে সে। যাক। আমি খেয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করলাম। আরতি দেবী, এই ভিক্ষা-দশাতেও আমার কাছে কয়েকটা ওষুধ থাকত। তার একটা হল যন্ত্রণা উপশমের অ্যাসপিরিন জাতীয় ট্যাবলেট; আর থাকত জোরালো ঘুমের ওষুধ। খেয়ে ফুটপাথে বা যেখানে যেদিন হোক শুয়ে পড়তাম। সেদিন ঘুমের তুটো ট্যাবলেট খেয়েও ঘুম আসে নি। স্নায়ু-শিরা বোধ করি এমন প্রবল উত্তেজনায় চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেছিল যে, ওই দ্বিগুণ মাত্রায় ঘুমের ওষুধও ঘুম আনতে পারে নি। ছিল একটা আচ্ছন্নতা মাত্র। তার মধ্যেই স্পষ্ট বুঝলাম—আলোর ছটা। চকিতের জন্য চোখ মেলে দেখলাম, সে সেই মনোহর সজ্জায় সেজে মাটির প্রদীপে ভর্তি তেল দিয়ে প্রদীপ হাতে ঘরে ঢুকছে। কাঠের পিলসুজটা টেনে কাছে এনে প্রদীপটা বসিয়ে সলতেটা আরও উস্কে দিল। তার পর কাছে বসল। আমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে সে, আমি চোখ বন্ধ করলাম সভয়ে। তাতেও বুঝতে পারলাম, কারণ তার ওই প্রদীপের শিখার দীপ্তি আমি চোখের পাতার নিচ থেকেই অনুভব করছিলাম; এবং তার উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছিল আমার মুখের উপর। এক সময় চোখের পাতার উপর আলোর দীপ্তি উজ্জলতর হয়ে উঠল মনে হল; বুঝলাম

আরও উস্কে দিয়েছে প্রদীপের শিখা। তারপর অনুভব করলাম আরও দীপ্তির সঙ্গে উত্তাপ। সে-দীপ্তি এত যে, বন্ধ চোখের অন্ধকার যবনিকা গাঢ় লাল রঙে রাঙা হয়ে উঠল। সব আচ্ছন্নতা তখন কেটে গিয়েছে আমার।

"বাইরে থেকে বিড়বিড় কথা ভেসে আসছে। বাইরে বোধ হয় রতনের মা দাওয়ার উপর বসে বকছে : 'ওই সীতা নাম! ও আমি কালই পাল্টাব। পাল্টাব। পাল্টাব। পাল্টাব। জনমদুঃখিনী সীতা। আমি তখনই বারণ করেছিলাম। রতন শুনলে না। উঁহু! সীতাহরণের পালাটা নয় এই রতনের যুদ্ধে হারানোতে শেষ হল! অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। এই বেরতো, বুক চিরে রক্ত দেওয়া, এর চেয়ে একালে অগ্নিপরীক্ষা কী হবে? কিন্তু তারপরেতে আবার বনবাস সীতার। উঁহু, উঁহু, ও-নাম আমি কাল পাল্টাব। পাল্টে তবে জলগ্রহণ করব।'

"তারপর একটু চুপ করলে। আবার শুরু করলে, 'বউ! অ-বউ! শুনছিস! কথা কইছিস না দুজনায়? রতন ঘুমুচ্ছে না কি? ঠেলে তোল না আবাগী! লজ্জা লাগছে? মরণ তোর লজ্জার! অ-বউ!'

"পাশের ঘরের কেউ যেন বললে,'ঠাকরুন, তোমার কি আক্কেল-বুদ্ধি কিছু নেই গা?'

" 'কেন গা? অন্যায় কী বলছি?'

" 'বলছ না? বলি মা ঘরের দোরগোড়ায় জেগে বসে থাকলে বউবেটায় কথা কয় কী করে গা?'

" 'তাতে কী হয়েছে, আমি তো চোখের মাথা খেয়ে চোখে দেখতে পাই না—!'

" 'এইবার কড়া কথা বলব !'

" 'তা বল না। আজ আমার আনন্দ আজ ঝাড়ু মারলেও সইব লা তুলসী। বল।'

" 'বলি কানের মাথা তো খাও নি? শুনতে তো পাও! না কী?'

" বুড়ী বললে, 'ওই দেখ! এটা তো মনে হয় নি তুলসী। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এই শুলাম। আমার চোখের পাতায় লক্ষ্মণের চোদ্দ বছরের ঘুমের মত এই দু-বছর দশ মাসের ঘুম জেগে আছে। শুয়ে জেগে থাকতাম, আর মনে মনে বলতাম ভগবানকে, কখনও বউকে, শেষে আমার সতী-অহঙ্কার এমনি করে খান খান হয়ে গেল! ভগবান তো কথা কয় না তুলসী। বউ বলত, কখনও না। দেখবেন আপনি!'

"হাসলে বুড়ী। তারপর বললে, 'তুলসী, এই আমি শুলাম লা। দেখ না, এখনিই ঘুমিয়ে যাব!'

"আরও কতক্ষণ পর। আর আমি থাকতে পারি নি। হাত জোড় করে উঠে বসেছিলাম। মেয়েটি নড়ে নি, নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে যেমন ঘুমন্ত আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, তেমনিই তাকিয়ে রইল। আমি কিছু বলবার আগেই সে মৃদু কঠিন কণ্ঠে বললে, 'তুমি কে? তুমি তো সে নও!' মুহূর্তে চোখ তার জ্বলে উঠল। এমন চোখ জ্বলে ওঠা আমি দেখি নি। সে উঠে দাঁড়াল।

"কথার সূত্র পেয়ে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম—হাতজোড় করেই বলেছিলাম, 'আমি ক্ষমা চাচ্ছি। অপরাধের আর শেষ নেই। কিন্তু আমি বলবার সময় পাই নি! কখন বলব?'

"মেয়েটি তখন ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো একখানা দায়ে হাত দিয়েছে। আমার কথা শুনে থমকে গেল। যাক, সে অনেক কথা, সংক্ষেপে বলি—!

এরপর আট দশ লাইন লিখে কেটে দিয়েছে। পাতাটা উল্‌টালে আরতি!

॥ এগারো ॥

পরের পৃষ্ঠায় সে শুরু করেছে—"সংক্ষেপে লিখে তৃপ্তি হল না আরতি দেবী তাই কেটে বিশদভাবেই লিখছি। কাটার লেখাটা স্বচ্ছন্দে পড়া যাবে। মিলিয়ে দেখবেন গরমিল পাবেন না। আর কি জন্যেই বা মিথ্যে আপনার কাছে লিখব? এ চিঠিও আপনার কাছে লিখতাম না। আপনি জানেন—সংসারে বাবা-মার মৃত্যুর পর আমি নিজেকে একলা করে গড়েছি। দাদার সঙ্গে বনে নি, সম্পর্ক রাখি নি। চাকরী নিয়েছিলাম যুদ্ধের। আপনাদের—না—আপনার সঙ্গে পথের মধ্যে কদিন খেলা ঘরে খেলুড়ের মত যোগাযোগ হয়েছিল, হয়তো বাঁধা পড়বার সুতোতেও পাক পড়েছিল—কিন্তু যেদিন তার আগেই চলে গেলাম—বেশ হাসতে হাসতেই গেলাম। এবং খেলার সময়টুকুর মধ্যেও এটুকু

পরিচয় বোধ হয় দিয়েছিলাম—যে মিথ্যে আমি বলি নি। যাক, যে কথা বিশদভাবে না-বলে তৃপ্তি পাচ্ছি না—তাই বলি।

"দেওয়ালের দায়ে হাত দিয়েছিল বউটি। চোখ তার জ্বলছিল। কিন্তু আমি হাতজোড় করে যখন বললাম, 'আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমার অপরাধের শেষ নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন—আমি কিছু বলবার সময় পাই নি। বলতে আপনারা দেন নি। বলুন কখন বলব? আর আমি তো আপনাকে চিনি নি। আপনিই আমাকে চিনলেন—রতন বলে!'

" 'আপনি কে? ওই কমফাটার আপনি পেলেন কি করে?'

"আমি বললাম 'সবই রতন আমাকে দিয়েছিল, আপনাদের দেবার জন্যে। তার খবর নিয়েই আমি আপনাদের খুঁজছিলাম। হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে ওই ঘাটটার সামনে এসে দাঁড়ালাম আর—।'

"অকস্মাৎ যেন বাঁধ ভেঙে গেল—ঝরঝর করে সে তার কি কান্না! কান্না আমি কমই দেখেছি আরতি দেবী। কারণ বাবার আগেই মা মারা গিছলেন। মা মারা গেলে আমি কেঁদেছিলাম—কিন্তু বাবা বলেছিলেন কাঁদতে নেই। কাঁদে দুর্বলেরা। সেই ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠছিলাম—তাই পরবর্তী জীবনে কারুর কান্না দেখলে শুনলে বিরক্ত হয়েছি মনে মনে। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল ওর সঙ্গে আমিও কাঁদি। মনে হয়েছিল স্বর্গ নরক না-মানি তবু মানছি এ কান্না স্বর্গীয়। স্বর্গ যদি থাকে—তবে রতন স্বর্গে বসেও তৃপ্ত হবে। তার সংসারের অতৃপ্ত মমতা-প্রেমের তৃষ্ণার

নিবৃত্তি হবে। আমিও কেঁদেছিলাম। কয়েক ফোঁটা জলের ঝরে-পড়ার পথ রোধ করতে পারে নি। চোখ মুছে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে দেখলাম তার কান্না। তারপর মৃদুস্বরে বললাম, 'কাঁদছেন আপনি, এ কান্নার হয়তো শেষ নেই আপনার। আমি এসেছিলাম তার খবরটা দিতে; বারবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই অনুরোধই সে করেছিল আমাকে। আমিও ভেবে দেখছিলাম যে, এ খবর আমি না-দিলে আপনারা কোনদিনই পাবেন না। তাই এসে আপনাদের গ্রাম খুঁজে সেখানে না-পেয়ে কলকাতায় এসেছিলাম—আপনাদের সন্ধানে। ওরা বলেছিল—বাগবাজার অঞ্চলে কোথাও আছে। সেই খুঁজতে এসে—।'

"মেয়েটি এতক্ষণে মুখ তুলে বলেছিল, 'এমন আশ্চর্য মিল তার সঙ্গে! আর গলায় ওই কমফাটারটা আমারই হাতের বোনা।'

"আবার একটু চুপ করে বলেছিল, 'আমি ভেবেছিলাম—আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে সে। মানে—।' একটু হেসে বলেছিল, 'তার ভারি একটা সন্দেহ বাতিক ছিল। আমার এই রূপের জন্যে—।'

"আমি কি উত্তর দেব? ওই কমফটারের কথাটারই জের টেনে ছিলাম—বলেছিলাম, 'কাপড়-চোপড় তো ভাল ছিল না; ওই একটা পেন্টুলান আর ছেঁড়া শার্ট—তাই শীতের জন্যে কমফাটার গলায় জড়িয়েছিলাম।'

"সে এবার বলেছিল, 'আপনি তা হ'লে—চাটুজ্জে সাহেব। সে শেষ চিঠিতে লিখেছিল—এখানে ভারি মজা হয়েছে আমাদের একজন ক্যাপ্টেন সাহেব আছে চ্যাটার্জী সাহেব—ঠিক আমার মত

দেখতে। যেন এক মায়ের পেটের ভাই। ভারি ভাল লোক, আমাকে খুব ভাল বাসেন।'

—" 'হ্যাঁ-আমিই চ্যাটার্জী সাহেব।'

"একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলেছিল—কথা বলতে বলতে সে চুপ করেই যাচ্ছিল মধ্যে মধ্যে—যেন তার সত্তাকে কেউ বাহির থেকে অন্তরের কোন এক অতল গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; আবার একটু পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কথা বলছিল; আমি বুঝতে পারছিলাম—সে ওই গভীরে নিমগ্ন হয়েই থাকতে চায়; কিন্তু কঠিনতম দুঃখের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেও তার নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই; কঠিনতম জীবনের সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে যেন সর্বস্ব-নীলামের পরওয়ানা নিয়ে; এ জাতের মেয়েদের জানি না প্রত্যক্ষভাবে, কিন্তু এদের কথা শুনেছি; বিশ্বাস করি নি কিন্তু যে মুহূর্তে ও দা হাতে নিতে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে আর অবিশ্বাস করতে পারি নি; একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মরবার সময় কিছু বলেছে সে?'

" 'না। শুধু বলেছে—কিছু করতে পারলাম না। কার হাতে দিয়ে গেলাম! মা-মা—সীতা-সীতা!'

" 'মায়ের কপাল। আর সীতার কপাল!' একটু চুপ করে থেকে বললে, 'সীতার কপাল সীতা জানত। কিন্তু ওই হতভাগীর?'

"হঠাৎ উন্মাদিনীর মত কপালে গোটা কয়েক চড় মেরে বলেছিল, 'এই—এই—এই!'

"আমি হাত ধরতে সাহস করি নি—শুধু বলেছিলাম, 'কি করছেন ? না-না। শুনছেন !'

"ক্ষান্ত হয়েছিল ওতেই। তারপর কিছুক্ষণ বসেছিল পাথরের মত। তারপর বলেছিল, 'কি করে মরল ? গুলিতে ? জাপানীদের ?'

" 'না। জাপানীদের নয়।'

" 'তবে !'

" 'সবটা তবে বলি শুনুন !'

"ধীরে ধীরে সবটা বলে গেলাম তাকে !'

"বেশ মনে পড়ছে কলকাতার মত মহানগরীও তখন ঘুমে শান্ত স্তব্ধ। শুধু গঙ্গার ধারে পোর্টকমিশনারের রেল লাইনে মধ্যে মধ্যে ইঞ্জিনের সিটি এবং শান্টিংয়ের শব্দ উঠছে। ক্বচিৎ কখনও এক আধখানা রিক্সার ঘণ্টা দু-চারবার বেজে চলে যাচ্ছিল।

"সব শুনে সে ধীরে ধীরে উঠে পাশের একটা দরজা খুলে ছোট্ট একটা কুঠুরীতে ঢুকে গেল। সেটা ওর ঠাকুর ঘর। সেখানে গিয়ে ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

"আমি একবার ভাবলাম সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে চলে যাই। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু তা পারি নি। ওই ঠাকুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতই বলেছিলাম, 'আমি তা হলে—'

"উপুড় হয়ে পড়েছিল সে, সেই অবস্থাতেই ঘাড় নেড়ে সে বলেছিল, 'না।'

"তারপর উঠে বসে বলেছিল, 'না। কাল যাবেন। আমি কাল

সকালে আপনার সঙ্গে খুব ঝগড়া করব। তারপর বেরিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। তখন আপনি চলে গেলে কথা উঠবে না। নইলে আজ যদি চলে যান—কাল সকালে আমাকে হাজার প্রশ্ন করবে, কি উত্তর দেব? আপনি আজ যেতে পাবেন না।'

"আর পারলাম না। আমার সকল শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি ফিরে গিয়ে বসলাম বিছানার উপর। সে সেই তেমনি করেই বসে ছিল। হঠাৎ বলে উঠেছিল একসময়, 'কিন্তু ওই হতভাগী? ওই কানী, রাবণের মা নিকষা, ওর কি হবে? হে ভগবান!'

"রাত্রি-অবসান আসছিল। জীবনের অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে আসতে হয়, দিনের আলো যথানিয়মে রাত্রির অন্ধকার মুছে দিয়ে আপনি এগিয়ে আসে। পৃথিবীর ঘোরার নিয়মে ওর একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। সকালবেলা পর্যন্ত কেঁদে, চোখ মুছে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় বলে গেল, 'যা বলেছি। আমার মরার আগে আপনি যাবেন না!'

"আজ কানে বাজছে, বুড়ী জেগে বলছে, 'সুপ্রভাত সুসংবাদ। আমার সতীগৌরব রেখেছিস মা, তার জন্যে আর এক বছর বেরতো বাড়ালাম। তোর গৌরব বাড়ুক মা। তোর পূজোর প্রচার হোক। আমার কাল নেই, ক্ষমতা গিয়েছে, নইলে ধুপচী মাথায় করে গাঁয়ে নগরে বলে বেড়াতাম, দেখ গো দেখ, মায়ের মহিমা দেখ!'

"একজন কেউ বউটিকে বলেছিল, 'ও বাবাঃ, মুখ-চোখ যে ফুলে উঠেছে গো-বউ। সারারাত বুকে মুখ রেখে কেঁদেছ মনে হচ্ছে!'

"বউটি উত্তর দিয়েছিল, 'সুখের দিনে দুঃখের কান্না যে বড় মিষ্টি ভাই।'

"আমি মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম। রতনকে পিঁপড়েতে খেয়ে ফেলত, ফেলত, আমি তাকে মেরে নিমিত্তের ভাগী হয়েছি। আবার এই বউটির মৃত্যুর সকল দায় পড়বে আমার উপর।

"সকালে বসেই ছিলাম। চা খেয়েছিলাম। বউটি চা দিয়েই বলেছিল, 'স্নান করে পূজো করতে হবে। না জানেন, বই দেখে পড়তে পারবেন তো। গীতা আছে, চণ্ডী আছে, নইলে বুড়ী কুরুক্ষেত্র তো করবেই, হয়তো সন্দেহ করবে। পূজোর আগে জল খেতে পাবেন না। চাইবেন না যেন!'

"মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে শুধু একটু হেসেছিলাম। দিনের আলোতে দেখলাম তাকে। হ্যাঁ, রতন বউ-বউ করত,—একে রাজ-রাণীর সুখে সুখী করবার জন্যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল,—সে তার মিথ্যে অহঙ্কার নয়; না সে তার মোহ নয়!

"কিছুক্ষণ পর ওই মা এসে বসেছিল কাছে।

"গায়ে হাত বুলিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরে সে আবোল-তাবোল কত কথা। 'সেই কথাটা মনে আছে? সেই ঘটনাটা? সেইটে রে! সেই—।' নিজেই বলে যাচ্ছিল অতীত ঘটনাগুলি। কখনও হাসি, কখনও বেদনার্ত দীর্ঘনিশ্বাস, সুখ দুঃখের স্মৃতি-মাখানো ক্ষোভহীন গ্লানিহীন সে এক জীবনানন্দের আশ্চর্য প্রকাশ!

"হঠাৎ মুখে হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'কাল তুলসী বলে, ওই

বউয়ের দাড়িওলা বর মানায় না ঠাকরুন। আর এমন ছেলে, কটা চোখ, কটা রঙ, কোট-পেণ্টুল পরলে সায়েব সায়েব লাগবে। দাড়িফাড়ি কামাতে বল। তা আমি বলি, ওরে, এ আমার শ্বশুর কুলের সাতপুরুষের দাড়ি! ওই দাড়ি রেখেছে বলেই চণ্ডী-গীতা পড়ে, পূজো করে, নইলে সব ভেসে যেত। এ তান্ত্রিকবংশের দাড়ি। তোর সংস্কৃত পড়া হল না, ব্যাকরণের আদ্যতেই ঠেকলি, পণ্ডিত বললে—মিছে চেষ্টা ঠাকরুন, ওর দ্বারা এ হবে না। আমি বললাম হবে না কি? এত বড় ঘরের ছেলে—পূজোর মন্তর মুখস্থ করুক, গঙ্গা-চান করুক টিকি রাখুক—দাড়ি রাখুক—নিশ্চয় হবে। হ্যাঁ—আমার কথা মিথ্যে হয় না। বলেছিলাম—বুক ঠুকে বলেছি আমি সতী আমার ছেলেকে সতীমা বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনে আমার কোলে ফেলে দেবেন। দেখ্ ফলেছে কি না!'

"এই সময়েই বউটি এসে বলেছিল, 'মা এখন কথা থাকুক, আমি তোমার ছেলেকে নিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসি। আব পথে কালীতলা মদনমোহনতলায় পেন্নাম করে আসব।'

" 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাই যা। দুজনেই জোড়ে যা। আমাকে নিয়ে হাঙ্গামা হবে। যা বাবা। যা।'

"আমার বুক কেঁপে উঠল থরথর করে। ভগবান মানিনে—তবু মনে মনে বললাম, 'হে ভগবান—তবে কি—। মেয়েটা কি সত্যিই জলে ঝাঁপ দিয়ে মরবে আমার সামনে?'

"মেয়েটি বললে, 'এস।' আমাকে অসহায়ের মত যেতেই হল। পথে বেরিয়ে মেয়েটি বললে, 'ভয় নেই, এখনি আমি ডুবে মরতে

যাচ্ছি না। আপনার কাছে সব বিবরণ আর একবার শুনব। ঘরে তো হবে না। বুড়ী কান পেতে আছে। ঘরে ঘরে কান খাড়া হয়ে রয়েছে। চলুন, গঙ্গার ধারে বসে শুনব।'

"যেখানটায় সেদিন আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, ঠিক সেইখানটিতেই বসে বলেছিলাম রতনের কথা। মেয়েটি নড়ে নি, চড়ে নি, গঙ্গার স্রোতের দিকে মুখ করে চোখ রেখে শুনে গিয়েছিল। রতনের প্রশংসা শুনে একবার—আর-একবার, তার মৃত্যুর কথা শুনে—ছবার নীরবে কেঁদেছিল শুধু।

"আমিই বলেছিলাম, 'আমি আর উপায়ান্তর না দেখে; ওই পিঁপড়েরা তাকে লক্ষ দংশনে ছিঁড়ে খাবে, নৃশংস-যন্ত্রণা সে ভোগ করবে, এ দেখে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। গুলি করেছিলাম। আমাকে ধরিয়ে দিতে চান দিন, ফাঁসি যেতে আমার কোন দুঃখ হবে না। বিশ্বাস করুন, কোন—'

"কথা কেড়ে নিয়ে মৃদুস্বরে ধীরভাবে বউটি বলেছিল, 'না। তা হলে আপনি আমাদের খবর দিতে আসতেন না। খুঁজতেন না। কাল আমাকে অবসর দিতেন না আপনাকে ভাল করে দেখতে, ভুল ভাঙাতে।'

"তারপর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

"বহুক্ষণ পর অসহনীয় হয়ে উঠেছিল আমারই; বলেছিলাম, 'উঠুন।'

" 'দাঁড়ান, ভাবছি!'

" 'কী?'

" 'কী করব আমি ! আমি তো এখনই ঝাঁপ দিয়ে মরতে পারি। কিন্তু তার পর? ওই বুড়ী? ভার তো আমার! তাকে যে আমি ভগবানের নাম নিয়ে বলেছিলাম—তুমি যাচ্ছ, মায়ের জন্য ভেবো না তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ভার আমার।'

"আমি বলেছিলাম, 'আমি কি করব বলুন! আমি বরং রাগ করার ভান করে পালিয়ে যাই।'

"দিগ-দিগন্ত হারিয়ে ফেলা মানুষের মত সে এক বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে গঙ্গার পরপারের দিকে সে তাকিয়ে বসে ছিল। নীরবে সে ঘাড় নাড়লে। না। তারপর মৃদুস্বরে বললে, 'তাতে বুড়ী উন্মাদ হয়ে যাবে। ও সহ্য করতে পারবে না। ছেলে ফিরে আসবে, সে কত আশা ওর। কাল থেকে কত বড়াই! আপনি পালিয়ে গেলে ও পথে পথে বুক চাপড়ে চাপড়ে বেড়াবে! না—ওভাবে আপনার যাওয়া হবে না। বুড়ীকে নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়ব। তা ছাড়া আমার মনের জোর সব যেন ঝড়ে পড়া চালা-ঘরের মত মাটিতে ভেঙে পড়েছে। আপনি রয়েছেন—তাই আপনাকে খুঁটির মত ধরে দাঁড়িয়ে আছি।'

"কি বলব—উত্তরে খুঁজে পাই নি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ওই বলেছিল, 'উপায় ওই এক। ওবেলা আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে আমি ছুটে বেরিয়ে আসব; এসে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। কিম্বা এই রেলের ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ব। গলায় দড়ি দিলে কি বিষ খেলে আপনি হাঙ্গামায় পড়বেন।'

"ওই সিদ্ধান্তই যেন সে স্থির করে নিয়ে ওঠবার উদ্যোগ করলে।

আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম—বললাম, 'না। দাঁড়ান।'

"সে হেসে বলেছিল, 'আর পথ নেই।'

"আমি বলেছিলাম, 'আছে। চলুন বাড়ি গিয়ে আমি সকল কথা খুলে বলি। আপনি ভগবান ছুঁয়ে বলুন—কাল রাত্রে আমি আপনাকে ছুঁই নি।'

"তার মুখে ঈষৎ একটু হাসি চকিতে দেখা দেওয়ার মত দেখা দিল, তাতে যত অবজ্ঞা তত দৃঢ়তা। সে বললে, 'আমার কলঙ্কের কথা ভাবছেন? না—তার জন্যে আপনি ভাববেন না। আমার অন্তর যতক্ষণ ঠিক আছে ততক্ষণ কোন কলঙ্কে আমার গায়ে ছেঁকা দেবে না। ওখানে আমি সত্যিই সীতা।" চোখ দুটো তার দপদপ করতে লাগল। তারপর আবার বললে, 'ওতে বুড়ী আপনাকে ছাড়বে না। হয় খুন করবে, নয় পুলিশের হাতে দেবে, তারপর নিজে খুন হবে।'

" 'তা হলে?'

" 'তা হলে ওই পথ। আমি মরি, আমার মৃত্যুতে আপনার মুক্তি।'

" 'সে—সে আমি কি করে হতে দেব বলুন! তার চেয়ে আমি এখান থেকেই পালাই। আপনি যা-হয় করবেন।'

" 'আপনি আপনার দিকটাই দেখছেন। আমার দিকটা ভাবছেন না! তার চেয়ে আপনি আজকের দিনটাও থাকুন। আমি ভাবি।

"আমি এবার তাকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম—একটা

কথা। যেটা তার মত মেয়ের ভোলা উচিত হয় নি। বলেছিলাম, 'কিন্তু,—কিছু মনে করবেন না। আমি যতক্ষণ থাকব আপনাকে মাছ খেতে হবে, সধবা সেজে থাকতে হবে—'

"হেসে সে কথার মাঝখানেই কথা দিয়ে বলেছিল, 'সে আমার মনে আছে। কিন্তু তাতে আমার পাপ হবে না। একটা আমার গোপন কথা আপনাকে বলি শুনুন। যে কথা আমার বাবা মা ছাড়া কেউ জানতেন না; স্বামী শাশুড়ীও না। আমার বাবা ছিলেন বড় পণ্ডিত। খুব বড় পণ্ডিত। তিনিই আমার কুষ্ঠীবিচার করেছিলেন; আমার ছিল বৈধব্যযোগ। আর দেখছেন তো আমার রূপ! বাবা বলতেন—এ রূপ যার হয় তার ভাগ্যে হয় বৈধব্য, নয় অগ্নিপরীক্ষা বনবাস। তাই বলতেন—আমাকেও বলেছিলেন—যার তার হাতে তোকে দেওয়া যায় না মা। কিন্তু আমি দরিদ্র, কোথায় পাব শ্রেষ্ঠ পুরুষকে! তাই লৌকিক বিয়ের আগে তোর অলৌকিক বিবাহ দেব। বিয়ের আগে তিনি আমাদের ঘরের শালগ্রাম শিলার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন গোপন অনুষ্ঠান করে। বলেছিলেন—পুরুষোত্তমের বিগ্রহের সঙ্গে তোর বিয়ে হল। এবার যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে হবে—ওই ওঁরই প্রতিনিধি। তোর লৌকিক স্বামী বাঁচে তো এতেই বাঁচবে; না বাঁচলেও ভার ওঁর—উনি রক্ষা করবেন; বিধবা তুই হবি নে; মঙ্গল বেটার অষ্টমে অত্যাচারের পথ আমি রোধ করে দিলাম।···বিধবা আমি নই—হব না; স্বামী আমার তিনি। তাই তো কাল থেকে তাঁকেই বলছি—বল, কি করব? দেখাও পথ—দেখাও।'

"আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। এ যে রূপ-কথা, অবিশ্বাস্য। কিন্তু ওর মুখে অবিশ্বাস্য মনে হয় নি। অবিশ্বাস্য মনে করতে ইচ্ছে হয় নি, সাহস হয় নি। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে এই প্রশ্নই করেছিল, 'বিশ্বাস করতে পারছেন না? উদ্ভট মনে হচ্ছে?'

"আমি সসম্ভ্রমে বলেছিলাম, 'না।'

"সে বলেছিল, 'আপনার মধ্যে মহৎ মানুষ আছে। দেবতা আছে। অন্যে হলে—আজকালকার বাবুরা—মুচকে মুচকে হাসত। আপনি—' হঠাৎ সে থেমে গেল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আচ্ছা—।' আবার থেমে গেল। কী যেন হঠাৎ মনে এসেছে। বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে।

"আমিই বললাম, 'বলুন!'

" 'আপনি ঠিক এমনি করে আমাদের সঙ্গে থাকুন না!'

"স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি।

" 'রতন সেজে?'

" 'হ্যাঁ! অন্তত ওই বুড়ী যতদিন আছে। যেমনভাবে কাল রাত্রি থেকে আমরা রয়েছি, তেমনিভাবেই থাকব। আপনাকে মনে হচ্ছে বড্ড চেনা, বড্ড আপনার।'

"মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, 'মনে হচ্ছে সে ছিল আমার পুরুষোত্তমের অক্ষম প্রতিনিধি, আপনি আমার—তাঁর প্রতিবিম্ব। পুরুষোত্তম কল্পবৃক্ষ—আপনি তার ছায়া হোন।'

"আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম তার দিকে।

" সে বলেছিল, 'শুনেছি, মধ্যে মধ্যে কায়া ধরে ছদ্মবেশে ভগবান

ভক্তের সেবা করেন, হাসেন, কথা বলেন, কৌতুক করেন। ধরা দেন না। আপনি ভগবানের ছায়া হয়ে আমাদের ধরা দিন না! আপনি আমাদের হোন,আমাদের বাঁচান, আমরা আপনার হব, শুধু আমাদের কায়ার কোন সম্পর্ক থাকবে না, সম্পর্ক থাকবে আর সবের। নতুন কালে শুনেছি, ছেলেমেয়েতে এমন বন্ধুত্ব তো হয়! সেখানে অবিশ্যি দুজনেই দুজনের বন্ধু। আমি ভট্চাজ বাড়ির মেয়ে—বউ। বন্ধু আমাদের হয় না, হাতে নেই। আপনি হবেন আমার পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব!' এর পর 'তুমি' বলে শুরু করলে 'সংসারে এসেছ, ভগবান সাজ, পুত্রহীনার পুত্র হও, স্বামীহীনার স্বামী হও, মানুষ ছিলে, দেবতা হও! পার না?' আমি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম তার মুখের দিকে। কথা শুনেও আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাকে দেখেও আত্মহারা হচ্ছিলাম। তার মুখের সে আশ্চর্য দীপ্তি—তার চোখে দীপ্তি, মুখে দীপ্তি, হাসিতে দীপ্তি, সে আশ্চর্য!

"তবুও আমি বলেছিলাম, 'কি বলছেন ভেবে দেখেছেন? এ যে আমার মৃত্যুযোগ।'

"সে বলেছিল, 'না এ তোমার অমৃতযোগ। মৃত্যুযোগে মরে মানুষ প্রেত হয়—এ অমৃতযোগ—এতে তুমি অমর হবে—মানুষ থেকে দেবতা হবে।'

"এবার আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এমন কথা তো শুনি নি কখনও। অনেক স্মার্ট কথা শুনেছি, শিখেছি বলেছি, স্যাটায়ারে এক সময় ঝোঁক ছিল নেশা ছিল; কিন্তু এমন অন্তর-ভরা মন

অভিভূত করা কথা তো শুনি নি! আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"মেয়েটি হেসে বলেছিল, 'বল!' তার পর দৃষ্টি দেখে বলেছিল, 'কী দেখছ এমন করে? আমার রূপ? দু-চোখ ভরে দেখ, যত পার! এ-রূপ তোমার জন্যে। তোমার আশ্রয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব, নির্ভয় হব, আমি আরও রূপসী হব। সাজব। তোমার আর আমার মধ্যে পিলসুজ রেখে জ্বেলে দেব ঘিয়ের প্রদীপ।'

"সেই দিন গঙ্গার জলে স্নান করবার সময় প্রবীরের নাম-পরিচয়, প্রবীরের শিক্ষা-দীক্ষা সব ডুবিয়ে দিয়ে সত্যিই রতন হয়ে ফিরে এসেছিলাম। বুড়ী খুব তিরস্কার করেছিল, বউটি মুখরার মত জবাব দিয়ে বলেছিল, 'তোমার ছেলেকে আমি খুঁটে বেঁধেছি, বেশ করেছি। চোখ গিয়েছে, দিলে তুমি রাখতে পারবে? ভাবনা, ভেবেই তো মলে! আমি থাকতে ভাবনা কিসের শুনি? সীতা বাম্নীকে জান না?'

"বুড়ী চীৎকার করে উঠেছিল, 'না-না। ও-নাম আর তুই মুখে নিবি না হতভাগী। ওই নামের জন্যে আবার হারাতে হবে। সীতার বনবাস! ও-নাম আর নয়। ওরে রতন, এখুনি নাম পাল্টা এখুনি।'

"আমার কী জানি কেন আরতি দেবী, 'রতি' নামটা মনে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকের মত তার কাহিনী মনে পড়ল। আমি আজ ভস্ম হয়ে অতনু হয়ে গেছি! ও হোক 'রতি'। তাই বললাম, একটু ঘুরিয়ে বললাম, 'মা, মরে বেঁচেছি। মদন তাই বেঁচেছিল। ওর এই রূপ, থাক না মা ওর নাম রতি!'

"বুড়ী বলেছিল, 'খুব ভাল ! খুব ভাল। রতি ! রতি !'

"রতি হেসে বলেছিল, 'আজ ফুল কিনে এনো। মালা গেঁথে তোমাকে সাজাব, আমি সাজব।'

" সত্যিই সেজেছিল। মাঝখানে জ্বলন্ত প্রদীপের আড় রেখে সে কী হাসি। সে কী মাধুরী তার মুখে !

"রাত্রির পর রাত্রি।

"সত্য গোপন করব না আরতি দেবী। জীবনে আলো আছে ছায়া আছে। উপকার-প্রবৃত্তি আছে। স্বার্থপরতা আছে, দেবতা আছে পশু আছে ; মধ্যে মধ্যে মনের অন্ধকারের মধ্যে সে পশুটার কি অধীর অস্থিরতা ! আমাকে পাগল করতে চেয়েছে। বলেছে—ও তোমার কাছে যে মাশুল আদায় করেছে তুমি তার বিনিময় কেন নেবে না। আক্রমণ করে আদায় কর। পশুর মত ভোগ কর।

"কিন্তু তা পারি নি। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পশুটাকে পায়ের তলায় চেপে ধরেছি। বলেছি—ওরে তুই পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব, তুই পশু নস।—

"জিতেছি। সে জয়ে যে কি আনন্দ ! যাক—তারপর বলি—

"আমি ধরলাম রতনের কাজ। ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, যন্ত্র যথেষ্ট বুঝতাম ! যুদ্ধের সময় রতনের কাছে কাজ শিখেছিলাম। কাজ আবিষ্কার করলাম। কারও কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করব, সেটা ভাল লাগে নি। সকালে বের হতাম রাস্তায়। কাঁধে যন্ত্রের ঝুলি। সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু ধরে, পথে কারুর মোটর অচল দেখলেই গিয়ে দাঁড়াতাম।

" 'দেব মেরামত করে ?' কাজ অনুযায়ী দাম বলতাম। মানুষ অনুযায়ীও বলতাম।

"মেরামত করে দিয়ে গাড়ি ঠিক চলছে বা চলবে দেখিয়ে দেবার জন্য তাদের সঙ্গেই চলতাম। পথে অচল গাড়ি দেখলে সেখানা থেকে নেমে এখানার পাশে দাঁড়াতাম;

" 'দেখব গাড়িটা ? চলছে না ? দেব মেরামত করে ?'

"চার টাকা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত! দিনে অন্তত চার-পাঁচখানা গাড়ি। পঁচিশ টাকা রোজগার হত। বাগবাজারের ওই বস্তি থেকে শোভাবাজারে এলাম। একখানা গোটা বাসা। আপনি দেখে এসেছেন।

"রতি কাজ ছাড়ল; একটি বাড়িতে সে রান্নার কাজ করত, সে কাজ ছেড়ে দিল! দিনে দিনে সত্যই রূপসী হল। আমি এই শেষকালে, অস্বীকার করব না আপনার কাছে, আমি শুধু করুণা করে, এক সন্তানহারা হতভাগিনী অন্ধ বৃদ্ধাকে পুত্রশোকের নিদারুণ আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই, মিথ্যা তার পুত্র-পরিচয়ের দুর্ভাগ্য মাথায় করে আত্মোৎসর্গ করি নি। আমি রতনকে যে-যন্ত্রণা থেকে রক্ষার জন্য গুলি করে থাকি, তারই শোধ দিতে ওখানে এমন করে থাকি নি। রতির ওই রূপ, ওই রূপে আমি জ্যোতির্লেখার চারিপাশে অদৃশ্য এক গণ্ডীকে ঘিরে এক বন্ধনে বাঁধা পতঙ্গের মত ঘুরেছি, কখনও এক জায়গায় বসে নিষ্পলক চোখে চেয়ে দেখেছি! রতি রতি নয়, ও জ্যোতি! ওর দাহিকা শক্তি নেই। থাকলে পুড়ে যেতাম বোধ হয়। না। পুড়তাম না,

এখানে বলি আরতি দেবী—আমার কামনাকে আমি স্বীকার করেও বলছি—আমার জীবনের শিক্ষা, আমার বংশধারা আমাকে বল দিয়েছে। আমার পশুকে আমি হার মানিয়েছি। যাক্— দিনের পর দিন, পুষ্টিতে, তুষ্টিতে, মার্জনায়, প্রসাধনেও আরও রূপসী হয়েছে। রাত্রির পর রাত্রি আমরা পাশাপাশি মুখোমুখি বসে থেকেছি, ওকে দেখেছি। ও হেসেছে, ওর হাতখানি আমার হাতে থেকেছে। তার পর হঠাৎ উঠে বলেছে, 'শুয়ে পড়—আমি যাই।' ও শুত পাশে একখানা ছোট ঘরে—ওর পূজোর ঘরে; ছোট এক ফালি ঘর; একটা দিকে ওর ঠাকুরের আসন। কত তার সাজ-সজ্জা। তারই সামনে একখানা কম্বল পেতে শুয়ে থাকত সে। এ ঘরে দেখেছিলেন ছোট একজনের তক্তাপোশে একটি বিছানাই ছিল। ও ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ত, আমি এ ঘরে থাকতাম। প্রথম প্রথম ছটফট করেছি, নিজের উপর ক্রোধ হয়েছে, মেয়েটার উপর হয়েছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর হয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমার সব ক্ষোভ সব অনুশোচনা দূর হয়ে গেল। এক আশ্চর্য আনন্দ অনুভব করলাম।

"অবিশ্বাসী নাস্তিক যারা তারা অবিশ্বাস করতে পারে; অবিশ্বাসই তাদের ধর্ম। এমনই একটি অসহায় নারী বিশ্বাস করে তাদের আশ্রয় করলে তারা কি করে তা জানি না তবে প্রেমে পড়ার বা পরস্পরের মধ্যে দেহবাদের সম্পর্ক স্থাপনের কল্পনায় আনন্দ পায় এ আমি জানি। আজ সে স্তর পার হয়েছি আমি। আপনিও বিশ্বাস করবেন এও জানি। আপনি মহাত্মাজীর সঙ্গে মহা দুর্যোগে নোয়াখালির মহাশ্মশান পরিক্রমা করে এসেছেন। আপনি প্রশ্ন

তুলবেন না, তবুও বলি—যদি কেউ প্রশ্ন তোলে তাদের বলবেন—বাক্যে এর ব্যাখ্যা নেই। শুধু একদিন কেউ যদি পরম বেদনায় আপনার মুখের সকল খাদ্যটুকু কোন অতি ক্ষুধাতুরকে দিয়ে নিজে উপবাসে থাকবার সুযোগ পায় তবে সে বুঝবে—এ বাস্তব, এ সত্য। একদিন আপনাকে বলেছিলাম, 'যে নেয় সে সব সময় দাতার চেয়ে ছোট নয়।' সব সময় কেন কোন সময়েই ছোট নয়—যদি সে পরম গ্রহীতার মত অসঙ্কোচে প্রাপ্য পূজা বলে তাকে নিতে পারে। ও সেই পরম গ্রহীতা।

"ও আশ্চর্য! একদিন বিধবা বিয়ের একখানা ছবি দেখতে গিয়ে মাঝখানেই উঠে চলে এল। বললে, 'রাম-রাম-রাম; এই দেখে?'

"আমি বললাম 'কেন?' ও বললে, 'কেন? বিধবার বিয়ে!'

"আমি বললাম, 'বিধবার বিয়ে সব দেশেই আছে; আমাদের দেশেও আছে।'

"ও বললে, 'সে দেশে অন্য সমাজে আরও অনেক কিছু আছে, যা আমরা করি না। অন্য দেশে শূয়োর খায় অখাদ্য খায়—তাও দোষের নয়, তাই বলে তাই তুমি খেতে পার?'

"এ কথায় আমি হেসেছিলাম—বেচারী জানে না ওর স্বামী রতন বেঁচে ফিরে এলেও এ কথায় মুখ টিপে হাসত। কিন্তু এর পর ও যা বললে তার জবাব আমি পাই নি। সে বলেছিল, 'স্বামী মরলে স্ত্রী, স্ত্রী মরলে স্বামী যদি বিয়েই করবে—তবে প্রেম-প্রেম-প্রেম করে এত গান হা-হুতাশ—এত ছড়া পাঁচালী গদ্য পদ্য কেন রে বাপু! মরণ সব।' তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা যে দেশে যে সমাজে

বিধবা বিয়ে আছে—সেখানে সব বিধবাই বিয়ে করে ? ধর আমাদের দেশে পুরুষদের বিয়ে করতে আছে বউ মরলে ; কিন্তু সবাই তো করে না। ওদের দেশেও তেমনি দু-চার জন বিধবা বিয়ে না করে থাকে না ? আমাদের মত ?'

"বলতে হয়েছিল, 'হ্যাঁ থাকে।' ও প্রশ্ন করেছিল, 'তাদের বুঝি ওরা ঘেন্নার চক্ষে দেখে ?'

"জবাব দিতে পারি নি।

"আর একদিন—এই সে দিন, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার এই মিস্ত্রী সেজে থাকতে কষ্ট হয়, না ?'

"আমি প্রসন্ন অন্তরেই ছিলাম, বলেছিলাম অকপটে, 'না।'

"খুব খুশী হয়ে বলেছিল, 'আমার চিনতে ভুল হয় নি ; তুমি আমার পুরুষোত্তমের প্রতিবিম্ব—আমার কল্পবৃক্ষের ছায়াই বটে।'

"সেদিন কথায় কথায় একটা কথা মনে উঠে গিয়েছিল। যুদ্ধ মিটে আসার সম্ভাবনায় কথাটা মনে হয়ে গেল। তাকে বললাম, 'এক কাজ করব রতি ? খুব ভাল হবে হয়তো।'

" 'কি গো' ?

" 'দেখ, যুদ্ধ মিটে গেছে ; আজাদ হিন্দ ফৌজের সবাই ছাড়া পেলে। এদিকে ওই অফিসারটাকে মারার কোন প্রমাণও আমার বিরুদ্ধে নেই। এখন আমি নিজের নামে নিজের পরিচয় দিই না কেন ? ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই চাকরী নিশ্চয় পাব। মাকে একটা

কিছু বললেই হবে। কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমাদের সুখে রাখতে পারব।'

"সে বলেছিল 'না।' বারবার ঘাড় নেড়েছিল।

"প্রশ্ন করেছিলাম, 'কেন রতি? মায়ের কাছে আমি রতনই থাকব। তোমার কাছে থাকব—সেই পুরুষোত্তমের ছায়া।'

"সে বলেছিল, 'না। তা হলে তুমি আমার কাছেই আর পুরুষোত্তমের ছায়া থাকবে না। আমি তখন লোভের পাপে সত্যি-সত্যিই তোমার রক্ষিতা হয়ে যাব। দেহের সম্বন্ধ না থাকলেও যাব।—'

আমি খুব বিস্মিত হই নি! কারণ ওকে তো আমি জানতাম। তারপর ও আবার বলেছিল, 'জান, তোমাকে আমি ভালবাসি! সত্যিই বাসি' ওই ভগবানের ছায়া বলে মনে করে নিয়ে বাসি। কিন্তু তোমার ওপর আমার লোভ নেই।' আর কিছু কথা বলেছিল আপনার সম্পর্কে। কোন মন্দ বলে নি। বরং বহু কথা বলার জন্য দুঃখই প্রকাশ করেছিল।—সে সব থাক।

"এই শেষ আরতি দেবী। এতটুকু কিছু গোপন করি নি! এত কথা, এত কথা কেন কোন কথাই আপনাকে লিখতাম না,—সেদিন শ্মশানে দেখা হলেও লিখতাম না। কিন্তু দেখলাম, সে-আপনিও আর নেই। আপনার চোখে মুখে পরম প্রশান্তি দেখেছি। আপনি মহাত্মাজীর সঙ্গে নোয়াখালি, গেছেন, তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন এটা জানতাম; কিন্তু সেদিন চোখে দেখলাম, তাঁর সাহচর্যের ছায়া পড়েছে আপনার উপর। মুখেচোখে বেদনা দেখেছিলাম, ক্রোধ

দেখি নি। তাই লিখলাম। আজ এ পালা চুকে গেল, একজন পরম শ্রদ্ধেয় মমতাময় বন্ধুর কাছে সকল কথা না-বলে সান্ত্বনা পাচ্ছি না বলে লিখেছি। আপনি এখন বুঝতে পারবেন বিচার করতে পারবেন। আর একটু ও-পৃষ্ঠায় দেখুন।

উদাস দৃষ্টিতে জানালার মধ্য দিয়ে ভাদ্রের সেই দিনটির রৌদ্রালোকিত আকাশের দিকে আরতি চেয়ে বসে রইল। ক্রোধ নয়, ঘৃণা নয়, বেদনা, শুধু বেদনা। অন্তর ভরে গিয়েছে। শরতের আমেজ-লাগা ওই গাঢ় নীল আকাশের চারিদিকে ছড়ানো অজস্র কৃষ্ণ-শুভ্র মেঘপুঞ্জের মত পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনায় যেন ভরে গিয়েছে অন্তর। চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল টপ টপ করে। মনে মনে বলতে গেল, প্রবীর তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু আগে পৃষ্ঠাটা ওল্টাল।

"পরশু বৃদ্ধা মারা গেলেন। আপনি দেখেছেন, মুখাগ্নি করেছিল সে-ই। শেষকালে অবান্ধব-বান্ধব অন্য জন্মের বান্ধব বলে আমাকে দিয়েও দেওয়ালে আগুন। আমি তখন ভাবছিলাম, এর পর? রতিকে সে-প্রশ্ন করবার সময় হয় নি, পাই নি। কিন্তু ওর মুখ-চোখ দেখে বুঝেছিলাম, এ-ভাবনা সেও ভাবছে। ভাবছে এর পর? আপনি লক্ষ্য করেন নি, সে কী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল গঙ্গার দিকে। সে যেন গঙ্গাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত উদাস দৃষ্টি! কী খুঁজেছিল বুঝতে পারি নি। বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'রতি!'

" 'বল।'

" 'কী ভাবছিলে এমন করে ?'

" 'কাল বলব।'

" 'আমি বলব ?'

"আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। রতির এই প্রথম কান্না। প্রথম দিন রতনের মৃত্যু-সংবাদে কয়েক ফোঁটা চোখের জল সে ফেলেছিল, কিন্তু সে কান্না নয়। এ কান্না—সে কী কান্না! কাঁদতে কাঁদতেই উঠে চলে গিয়েছিল। তারই মধ্যেই কোন রকমে বলেছিল, 'কাল। কাল।'

"পূজোর ঘরে গিয়ে শুয়েছিল।

"আমিও শুয়েছিলাম। ঘুম আসে নি। শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সকালে উঠে দেখলাম রতি নেই। পেলাম একখানা চিঠি। লিখেছে, 'সারারাত কাঁদলাম। মা মরল। বন্ধন কাটল। আর তো কোন ধর্মের কোন ন্যায়ে আমি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারব না। না, পারব না। তোমাকে এইভাবে বেঁধে রাখব কী বলে ? আমার অধিকার নেই। বর্ষা গেল, এইবার যে মেঘ কাটিয়ে সূর্যচন্দ্রের মত উঠবার সময় হয়েছে। আমার তো সঙ্গে যাবার শক্তি নেই, উপায় নেই। তাই সুতোকাটা ঘুড়ির মত ভাসলাম। তুমি আমার পুরুষোত্তমের ছায়া। বহু-ভাগ্যে ও-ছায়া মেলে, মিলেছিল আমার। এবার কাল হয়েছে, আমাকে ও-ছায়া ছেড়ে সরতে হবে। তুমি বুঝতে পার না, আমি পারি, তুমি আমার কাছে তো তোমার ইচ্ছায় নেই ; তিনি

দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি তাঁর ইচ্ছায় তাঁর ছায়ার মত আমার উপর নিজেকে মেলে রেখেছ। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। তাঁর কষ্ট হচ্ছে। তাই চললাম। শ্মশানে দেখেছিলে, কোন্ দিকে তাকিয়েছিলাম? গঙ্গাসাগরের দিকে। ভরা গঙ্গা এখন, কুটো পড়লেও সেখানে টানছে। সেখানে কামনা নিয়ে যাচ্ছি তো! কী কামনা সে বলব না। আমায় খুঁজো না।···শেষে একটা কথা বলি। তুমি আমার পুরুষোত্তমের ছায়া। তোমার কোন গ্লানি নেই, অন্যায় নেই, আমি জানি। তবুও লোকে যখন তোমার কথা শুনবে—তখন আমার স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য অত্যাচারী সায়েবকে যে তুমি মেরেছ তা নিয়ে কথা তুলবে। বিচার করতে চাইবে—তুমি পিঁপড়ের কামড়ে নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে তাকে যে গুলি করেছিলে, সেটা ন্যায় কি অন্যায়। পরীক্ষা সংসারে ভগবানকেও দিতে হয়। তুমিও দিও। তুমি সব আগে গিয়ে বিচার চাও। বল, আমার বিচার কর। আজ দেশ স্বাধীন। এ-দেশের যে-দণ্ড আসুক, তুমি পিছোবে কেন? মুক্তি তুমি পাবে। না পাও, তাতেই বা কী? ন্যায়ের অবতার ওই তো বসে আছেন বেলেঘাটায়। তাঁর কাছে গিয়ে বল—বিচার কর। ইতি—রতি।'

"আবার পুনশ্চ লিখেছে, 'তুমি যেন রতি নামে আর কাউকে ডেকো না।'

"আমি মহাত্মাজীর কাছেই যাচ্ছি আরতি দেবী, আত্মসমর্পণ করতে। ওই বিচিত্র মেয়েটা এই সাহস আমায় দিয়ে গেছে। তাই

বা শুধু বলি কেন ; আমি দিল্লীর রাজকর্মচারীর ছেলে, ক্লাবের স্বাদ পাওয়া অতি আধুনিক—সব কিছুতে অবিশ্বাসী ; পুণ্যের নামে হেসেছি, সতীত্ব সততাকে ব্যঙ্গ করেছি, প্রেমকে স্বীকার করি নি ; আমাকে সে এক আশ্চর্য দিব্য পৃথিবীতে উত্তরায়ণ করিয়ে দিয়ে গেছে। মৃত্যুকে আমার আর ভয় নেই। ইতি—

প্রবীর।”

বিশ্ব-পৃথিবী ঝাপসা হয়ে যেন কুয়াশায় ঢেকে গেল। সে কুয়াশা ধীরে ধীরে কাটল ! আরতির অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কোন গ্লানি নেই, দুঃখ নেই। মনে মনে বললে, ‘তোমার যাত্রা শুভ হোক প্রবীর। নেবে বৈ কি—যা করেছ, তার বিচারে যা প্রাপ্য তা নেবে বৈ কি ! কঠিনতমই যদি হয়, আমি কাঁদব ! কারণ তুমি আমার। তোমার জন্য আরতিও তো কম তপস্যা করে নি। যে পৃথিবী বলছ ; তার আভাস তো সেও পেয়েছে। পরম দুঃখেই তো তার সিংহদ্বার খোলে।’

আরতি প্রতীক্ষা করে রইল। হয় মুক্তিতে মালা দিয়ে স্বাগত জানাবে, নয় শবাধারের জন্য মালা নিয়ে যাবে, দিল্লীর লালকেল্লা পর্যন্ত।

আকাশ রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে। শিবাস্তে পন্থানঃ।

—শেষ—